আমাদের কথা

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার | ২০২১

আমাদের কথা

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার

Affiliated to Indian Cultural Centre, Qatar
Under the agies of Embassy of India, Qatar

২০২১

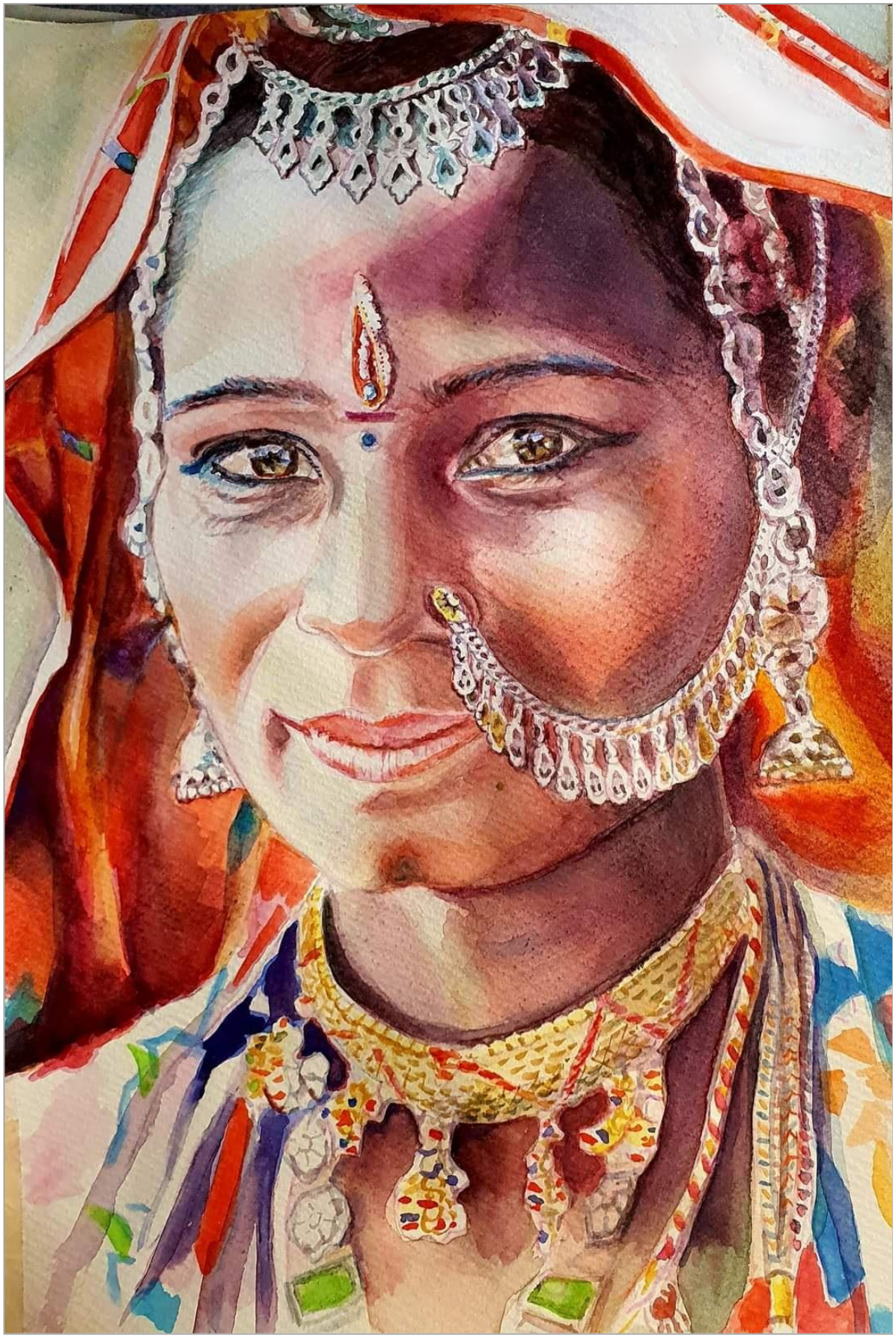

চিত্র-শিল্পী: মঞ্জু চৌধুরী

Ambassador

भारतीय राजदूतावास
السفـــارة الهنـــدية
EMBASSY OF INDIA
P.O. BOX 2788, DOHA-QATAR
Tel.:(+974) 4425 5703, Fax:(+974) 4467 0448
E-mail :amb.doha@mea.gov.in
Homepage :http://www.indianembassyqatar.gov.in
Twiter : @IndEmbDoha

MESSAGE

It is a matter of joy to note that Bangiya Parishad-Qatar has completed 25 glorious years. The Embassy of India-Doha heartily congratulates them for this feat. Since inception Bangiya Parishad-Qatar has been at the forefront in showcasing Indian culture and heritage, especially Bengali Culture and heritage, to the Indian diaspora at large.

Bangiya Parishad's participation in celebrating 75th year of Indian Independence in line with Azadi Ka Amrit Mahotsav through event like "Bharat Bhagya Bidhata", "Unsung Heroes of Bengal" has been truly commendable. It is underscored to put on record its recent participation in the India-Bangladesh Maitri Divas celebrations held on 6 December, 2021 in Qatar.

In addition, Bangiya Parishad Qatar has continuously been involved in social causes, viz. assisting Labour Camps through distributing food packets and providing aid to individuals in distress who have been severely impacted by Covid 19 pandemic.

We once again congratulate the incumbent management committee, all previous members of management committee, including founder members on this Silver Jubilee of Bangiya Parishad-Qatar.

(Deepak Mittal)

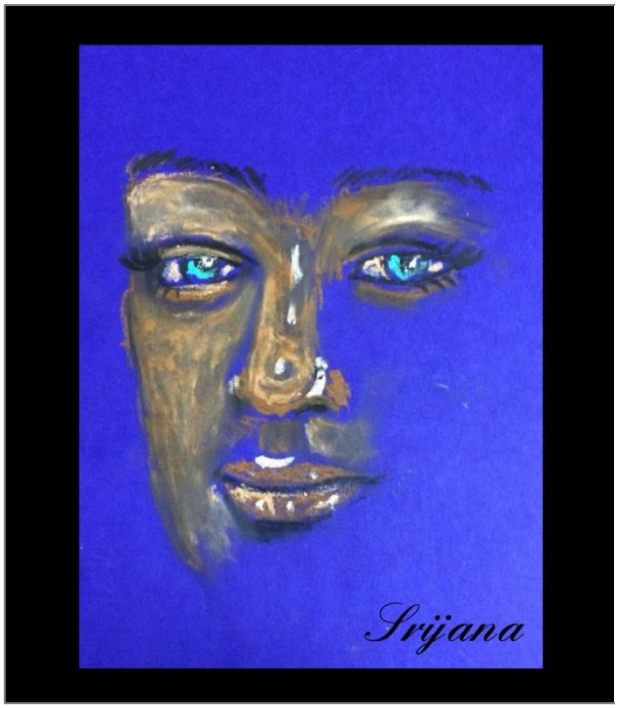

চিত্র-শিল্পী: সৃজনা রায়মন্ডল

চিত্র-শিল্পী: মৌলি প্রামাণিক

চিত্র-শিল্পী: ঐশানী মুখার্জী

চিত্র-শিল্পী: অর্ণব চক্রবর্তী

'বঙ্গীয় পরিষদ কাতার', কাতারে অবস্থিত যেসকল অনুরূপ সংঘ আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রবীণতম। এটি সমগ্র সম্প্রদায়ের কাছে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চিত্রিত করার জন্য একটি অনন্য সত্ত্বা । রজতজয়ন্তী বর্ষে এই গৌরবময় সংস্থার নেতৃত্ব দিতে পাওয়ার সুযোগ খুবই আনন্দের ও সম্মানের। আমি, আমাদের সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পূর্ববর্তী সভাপতিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এই সংস্থাটি তৈরি করার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং মহৎ প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছেন, এবং তারই ফল স্বরূপ আজ ২৫ বছর পর বঙ্গীয় পরিষদ কাতার একটি সুনামধন্য, নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হয়ে উঠেছে। আমাদের পূর্বসূরিদের প্রতি কৃতজ্ঞতটা এবং ভালবাসা জ্ঞাপনের প্রতীকী রূপে, আমরা সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রদূতের দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত সভাপতিদের সম্বর্ধনা জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত কৃতার্থ।

আমরা একান্ত ভাবে কৃতজ্ঞ, কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের থেকে পাওয়া সমস্ত রকম সমর্থন, উৎসাহ ও নির্দেশনার জন্য। আমি আমাদের বঙ্গীয় পরিষদ কাতারের তরফ থেকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় ড: দীপক মিত্তল মহাশয় এবং দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাদের, যাঁরা প্রতিনিয়ত আমাদের পাশে ছিলেন এবং পূর্ণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন BPQ -র প্রতিটি কার্যক্রমে।

ভারতের স্বাধীনতা উদযাপনের ৭৫তম বছরে আমাদের সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আইসিসির (ICC, Qatar) কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

ভারত ভাগ্য বিধাতা, বাংলার আনসাং হিরোস (Un-sung Heroes) ইত্যাদির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় পরিষদ কাতারের আত্বিক অংশগ্রহণ, আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের (Azadi ka Amriit Mahotsab) উদ্যোগকে এক আলাদা মাত্রা নিশ্চয়ই এনে দিয়েছে। আমাদের চমকপ্রদ পারফরম্যান্স সামগ্রিকভাবে ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে অর্জন করেছে যারপরনাই প্রশংসা এবং অভিনন্দন।

করোনা মহামারীর এই বিশাল প্রভাব গত কয়েক বছর নির্মমভাবে মানবজাতিকে নাড়া দিয়েছে, আমাদের কিছু সদস্যদের কাতার ছেড়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে সুষ্ঠ জীবীকার খোঁজে । একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা হওয়ার পাশাপাশি, বঙ্গীয় পরিষদ কাতার - ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের দেশের মানুষের সাথে, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পেরেছি ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনকে সমর্থন করে; আমরা ভারতে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য হিল ইন্ডিয়া আন্দোলনের অংশ নিতে সক্ষম হয়েছি; কখনো এগিয়ে যেতে পেরেছি কাতারের শ্রম শিবিরে খাবারের প্যাকেট বিতরণ করতে। সীমিত সম্পদের ওপর এবং আমাদের সদস্যদের ওপর সকল ভরসা রেখে বঙ্গীয় পরিষদ কাতার সর্বদা বিধ্বস্ত মানুষের প্রতি সহায়তা প্রসারিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

"আমাদের কথা"-এ আমার কথা শেষ করার আগে, আমি আবার বঙ্গীয় পরিষদ কাতারের সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, যাদের ফলপ্রসূ অবদান ২৫ বছরের বঙ্গীয় পরিষদ কাতারের যাত্রার মূল আধার ও গৌরবের প্রধান কারণ।

কোরোনার তৃতীয় পর্বের ভাইরাস - ওমিক্রন এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে আর তাই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে করোনার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। সকলকে অনুরোধ করবো, অনুগ্রহ করে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। নিরাপদে থাকুন , সুস্থ থাকুন।

বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী

সভাপতি

বঙ্গীয় পারিষদ কাতার ২০২১ - ২০২২

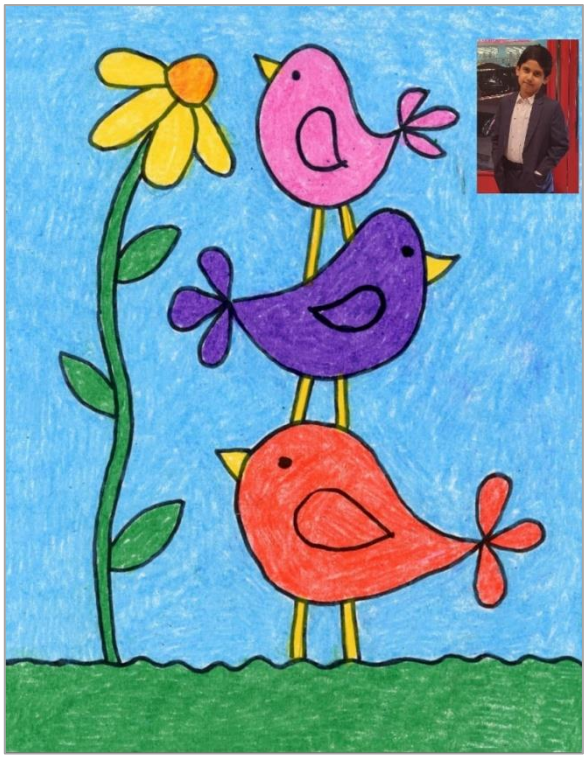

চিত্র-শিল্পী: রুদ্রজিৎ ব্যানার্জী

চিত্র-শিল্পী: সানভী শ

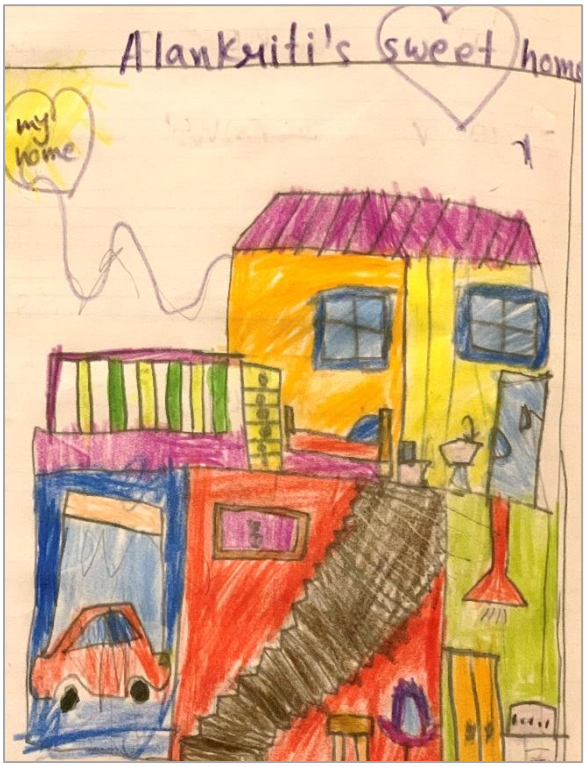

চিত্র-শিল্পী: অলংকৃতি রায়

চিত্র-শিল্পী: অদিতি বাচস্পতি

আমি রজতের মতো শুচি-স্নিগ্ধ ।।

স্বপ্ন আমার চোখে,
দৃঢ়তা আমার স্কন্ধে,
প্রত্যয় আমার মননে ।
আমি অদম্য,
আমি চঞ্চল ।।

আমি শিশুর মতো চপল হয়েও,
পেতে চাই প্রৌঢ়ের প্রজ্ঞা।
আমি মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়েও,
নিতে পারি প্রেয়সীর আজ্ঞা ।।

আমি বৃত্ত ভাঙার অভিকর্ষণ,
আমি আধুনিকতার তরঙ্গ।
আমি পরিশ্রান্তের নিথর সমুদ্রে,
এক উদ্বেল আরাধনা-মগ্ন।।

আমি রজতের ন্যায় শুভ্র।।

বঙ্গীয় পরিষদ কাতার-এর রজত জয়ন্তী বর্ষে আপনাদের অসংখ্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে 'আমাদের কথা'-এর ২০২১ সংস্করণ প্রকাশ করতে চলেছি। আমার বিশ্বাস এই পত্রিকা-তে আপনারা খুঁজে পাবেন আপনাদেরই কথা, ভাবনা ও সৃজনশীলতার এক বৃহৎ জগৎ।

২৫ বছর অনেকটা সময়, অনেকটা পথ চলে পাওয়া তারুণ্য। এই পথে নিশ্চই অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি ছিল, ছিল অনিশ্চিয়তাও । অনেক চিন্তা, অনেক পরিশ্রম-এর সিঁড়িভাঙা অঙ্ক কষে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা, যা সত্যিই গর্বের, অহংকারের।

তারুণ্য ব্যাপারটি শুরুর পংক্তি-গুলোর মতো; এর বিস্তার অনেকখানি, সেজন্যে খানিকটা গোলমেলে তো অবশ্যই। সৃষ্টির নিয়মে এই তারুণ্য মানুষের জীবনেও আসে, আসে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে, কিংবা সামাজিকতার পদ্ধতিতে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় ২৫ বছর বয়েসেই মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ পূর্ণতা পায় এবং চিন্তার গভীরতা, দৃষ্টিকোণ ও ব্যাপ্তি পরিপূর্ণতা পায়। জানি না, হয়তো কাকতলীয় ভাবে এই রজত জয়ন্তী আমাদের আত্ম-উপলব্ধির নতুন পথ দেখাবে কিনা? আমার বিশ্বাস 'হ্যাঁ', কিন্তু সময়ই এর স্বার্থক উত্তর দেবে।

এবার আসি পত্রিকার কথায়। মূল বিষয় 'ফিরে দেখা'। এখানে আছে কাতার-এর বঙ্গীয় পরিষদ ও সমাজের কাহিনী, আছে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পরিবার-শহর-গ্রাম এর কথা, কিছু স্বর্ণালী মুহূর্ত বা হারিয়ে যাওয়া শিল্প। লিপিবদ্ধ আকারে 'ফিরে দেখা' বিষয়গুলোর এক ঐতিহাসিক মাত্রা আছে, যা নিঃসন্দেহে আপনাদের ভালো লাগবে।

কবিতা ভাবের রূপক। কবিদের বিচরণ বিভিন্ন মাত্রায়, শব্দচয়নে,ছন্দের মূর্ছনায় কিংবা বিষয়ের মায়াজালে। আশ্চর্য হতে হয়, সবার লেখাই কী স্বতন্ত্র, কী সাবলীল।

আমার বিশেষ পছন্দ 'ভিন্ন স্বাদের লেখা' - এর বিষয় গুলো। এখানে ভাষার পাঞ্জাকষা আছে, সহজ গল্প আছে, আছে অনুভূতির সূক্ষতা। উঠতি লেখকেরাও যোগ দিয়েছেন সমানতালে।

বাঙালী যতটাই ভ্রমণ রসিক, ততটাই খাদ্য-অন্ত-প্রাণ। তাই ভ্রমন-কাহিনী এবং রান্নাঘর যোগ দিয়েছে 'আমাদের কথা'-তে।

২০২১ এই বর্ণময় বছর এবং তাকেও ধরে রাখা গেছে কিছু লেখা আর ফটোতে। হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এগুলো উপহার হিসেবে রয়ে যাবে।

বাংলার চিত্র-শিল্পের 'সেই ট্রাডিশন আজো চলিয়াছে'। এই শিল্পে দক্ষতা এবং বিষয় দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিল্পীরা, বিশেষতঃ শিশু-শিল্পীরা আপন শৈলীতে যেন মহার্ঘ্য অর্পণ করেছে। চিত্রের সমাহারে 'আমাদের কথা'-কে সাজিয়ে দিয়েছে মুক্তো-মালায়। তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

অসংখ্য ধন্যবাদ সকল লেখক ও কবিদের, যাঁরা 'আমাদের কথা'-তে প্রাণ-দান করেছেন। আমি দাবি করবো না এই সংস্করণ ত্রুটিহীন, কোনো রয়ে যাওয়া ভুল নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

আশা করি 'আমাদের কথা' ২০২১ সংস্করণ আপনাদের অনেক ভালো লাগবে।

- *সুমন্ত ঘোষ*

চিত্র-শিল্পী: সঞ্জীনা ব্যানার্জী

চিত্র-শিল্পী: সাত্ত্বিক দত্ত

চিত্র-শিল্পী: শ্রীপূর্ণা বাচস্পতি

সূচীপত্র

MESSAGE FROM AMBASSADOR OF INDIA IN QATAR ৩
সভাপতির কলম ৫
সম্পাদকীয় ৭

ফিরে দেখা

স্মৃতি সততই মধুর - নীলাংশু দে ১১
আমাদের কথা - যতীশ নন্দী ১৩
এ পরবাসে - জয়তী ১৫
PAST = BABA - Sudesna Sen ১৬
আমার শহর জামশেদপুর - মৌ বিশ্বাস ১৭
কলি – কাতা - শ্রীরূপা মিত্র ১৮
ঝিলপাড়, মাচা, শহর এবং EINSTEIN - উৎপল মন্ডল ২১
হে অতীত, কথা কও - মৃদুছন্দা সিনহা ২৩
আমাদের শহর দিনহাটা - ধৃতিমান রায়মন্ডল ২৪
বন্ধুকে লেখা চিঠি - সজল কাজী ২৭
স্বর্ণালী সন্ধ্যায়··· কিছু মুহূর্ত - উর্মিলা অধিকারী এবং অন্যান্য ২৮

কবিতা-গুচ্ছ – ১

মে দিবস এবং একটি গোলাপ - দেবযানী বিশ্বাস ২৯
মিলন - প্রদীপ ঘোষ ২৯
THE COVID CHRONICLE - Satarupa Nandy ৩০
SMALLER GARDENS (AN ACROSTIC SONNET) - Avik Datta Gupta ৩১
আলোর খোঁজে - দেবযানী বিশ্বাস ৩১
A CLUTTER OF UGLY PAGES - Avik Datta Gupta ৩২
অবিশ্বাস্য - শ্রীরূপা মিত্র ৩২
মূল্যবোধ - আত্রেয়ী চক্রবর্তী ৩৩
দুটি ডানা - রাশিদা সুলতানা ৩৩
অর্ধ্যসত্য জীবন - প্রদীপ ঘোষ ৩৩
প্রচেত তোমায় - পর্ণিনী চ্যাটার্জী ৩৪
Tuমি চাইলে - রাজীব মন্ডল ৩৪

ভিন্ন-স্বাদের লেখা

ইয়ে - তুষার কান্তি মন্ডল ৩৫
বড় দাদু - সুপর্ণা ঘোষ ৩৭
CHAMPIONS LEAGUE UPDATES - Adheep Sengupta ৩৯
HOW IS HISTORY USEFUL TO US? - Shreyas Ghosh ৪১
MOVING WITH THE FLOW OF TIME – A STRATEGY - Priyasha Ghosh ৪২
জানালা - সৌম্যা শিকদার ৪৩
RABINDRANATH TAGORE'S VIEWS ON EDUCATION - Chandrima Guha Roy ৪৬

রান্নাঘর

CHOWLET - Ayantika Mukherjee ৪৮

কবিতা-গুচ্ছ - ২

আজব চিকিত্সা - অরূপ কুমার চক্রবর্তী ৪৯
স্বপ্নামৃত - প্রদীপ ঘোষ ৪৯
VOICE... - Sunipa Dutta ৫০
জীবন মানে? - বিজন কুমার চৌধুরী ৫১
ফেবুতে কাবু - সৌম্যা শিকদার ৫২

ভ্রমণ

আকাশে আজ রঙের খেলা - আদৃতা চক্রবর্তী ৫৩
Glimpses of Greece - Subhankar Biswas ৫৫
জাঞ্জিবার @ তাঞ্জানিয়া - শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী ৫৬
এভাবেও ফিরে আসা যায় - ত্রিনয়ন ও পর্ণিনী চ্যাটার্জী ৫৯

এক-ঝলকে ২০২১

EXPANDING BOUNDARIES - Kaushik Mukherjee ৬৫
অনুপ্রেরণা - সুবীর কুমার দত্ত ৬৬
ক্রীড়াঙ্গনে ৬৬
সংস্কৃতির বন্ধনে ৬৭
শিরোনামে ৬৮

চিত্র-শিল্পী:

প্রচ্ছদ - চন্দ্রিমা গুহ রায়
অলংকরণ - শ্রীজাত ঘোষ

মঞ্জু চৌধুরী ২, ১৬
সৃজনা রায়মন্ডল ৪
মৌলি প্রামাণিক ৪
ঐশানী মুখার্জী ৪, ৩৩, ৫১
অর্ণব চক্রবর্তী ৪
রুদ্রজিৎ ব্যানার্জী ৬
সানভী শ ৬, ৪৫
অলংকৃতি রায় ৬
অদিতি বাচস্পতি ৬, ৩৪
সঞ্জীনা ব্যানার্জী ৮, ৩০
সাত্ত্বিক দত্ত ৮
শ্রীপূর্ণা বাচস্পতি ৮, ২২
প্রত্যুষা ঘোষ ১২, ১৫, ৩১, ৩৬
দীপাঞ্জন নন্দী ১৪
অনুশা কর ১৯
সুস্মিতা দাশগুপ্ত ২০, ২৯
ভিহান রায় ২১
সংকল্প রায়মন্ডল ৩১
অঙ্কুশ ঘোষ ৩২
উপমন্যু বোস ৩৪
স্নিগ্ধিক দত্ত ৩৭
ঋষিকা দাস ৩৭
আর্থিত ঘোষ ৩৭
কৌশানী মুখার্জী ৩৮
অমৃতা রক্ষিত ৪০, ৫১
অদৃজা ভট্টাচার্য ৪২, ৪৩, ৪৪
শৌর্য চক্রবর্তী ৪৭
অঞ্জলি চক্রবর্তী ৫০
স্বস্তিকা বসু ৫১
সুমিতালী ঘোষ ৫২

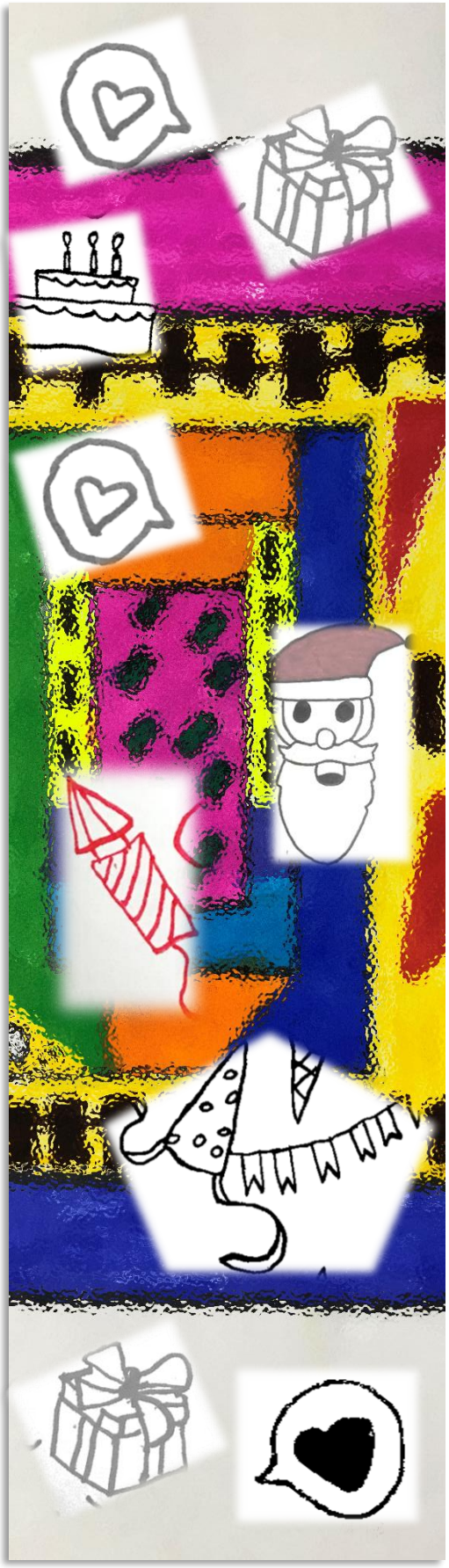

স্মৃতি সততই মধুর

নীলাংশু দে

সৌদি আরব থেকে বেশ কয়েকটা বছর চাকরি করে শারজা হয়ে কাতারে চলে এসেছিলাম 1998 সালের জুলাই মাসে। সেদিনটা মনে আছে এখনো।

যখন নেমেছিলাম কাতার এয়ারপোর্টে দুবাই থেকে, মনে হয়েছিল খুবই ছোটো যায়গা - হয়তো একটা গ্রাম। সেখানে কারা আছে - ভারতীয়রা কত আছে কিছুই জানতাম না, বাঙালি কতো আছে তো জানতামই না। সেই থেকে আমার কাতার অধ্যায় শুরু।

১৯৯৮ সাল থেকে ৭-৮ মাস কাতারে; কাতার-পেট্রোলিয়াম দুখানে কাজ করতে এসেছিলাম। পরিচিতি হলো যারা ওখানে আছে তাদের সঙ্গে, পরিচিতি হলো বাঙালিদের সঙ্গে এবং বঙ্গীয় পরিষদের সঙ্গে। বঙ্গীয় পরিষদের তখন শুভ সূচনা। ১৯৯৬ সালে গঠিত নতুন সংগঠনের সেই সময় দ্বিতীয় পরিচালন-গোষ্ঠী কাজ করছে। প্রচুর মতের অমিল সত্ত্বেও, সুন্দর বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ করছিল বঙ্গীয় পরিষদ। আমি ও যুক্ত হয়ে গেলাম সেই সংগঠনের সাথে।

চড়ুইভাতি, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবেতেই জড়িয়ে পড়লাম।

বঙ্গীয় পরিষদে আমার একটা পরিচিতি তৈরি হল আমার সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য।

এরপর কয়েক মাস কেটে গেল; দুবাই থেকে একটি ভালো চাকরির অফার পেলাম এবং কাতারকে বিদায় জানিয়ে ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে দুবাই চলে গেলাম। কিন্তু বিদায়-লগ্নে যারা বিদায় জানাতে এসেছিল, সেই নব্য পরিচিত প্রচুর বন্ধু-বান্ধব কে বলেছিলাম যে আবার দেখা হবে।

কিন্তু সেই দেখা যে কাতারেই হয়ে যাবে সেটা ভাবি নি। একেই বলে ভবিতব্য। দুবাইতে ভালই চাকরী করছিলাম, কিন্তু ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে আবার কাতার থেকে ভালো চাকরীর অফার পেলাম। এবার সাক্ষাত কাতার পেট্রোলিয়ামের চাকরী।

প্রথমবার একলা আসলেও এবার কিন্তু সপরিবারে কাতারে ফিরলাম - সঙ্গে এবার আমার স্ত্রী এবং দুই ছেলে।

দেড় মাসের মধ্যে বঙ্গীয় পরিষদের AGM। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সরকারদা (Animesh Sarkar) দায়িত্বভার ছেড়ে দিলেন। বাকি সদস্যদের অনুরোধে আমি সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যদের ভালোবাসার টানে এবং নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণায় সেই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। নতুন পরিচালন সমিতি দায়িত্বভার গ্রহণ করল 9 জুন 2000 সালে। আর নিজের হাতে কাজ করার তাগিদে, আমি হলাম সাধারণ সম্পাদক।

কাতারে ফিরে খুব আনন্দিত হলাম কারণ প্রথমবার বঙ্গীয় পরিষদ-এর সঙ্গে যেভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম, সেইভাবে আবার সপরিবারে জড়িত হবো ভেবে।

আমি ছিলাম এই পরিচালক সমিতিতে একেবারে নতুন। কিন্তু আমি সবসময় চিন্তা করছিলাম কি করে বঙ্গীয় পরিষদে কিছু নতুন অনুষ্ঠান শুরু করা যায়।

তখন কিন্তু কাতারের এখনকার মত এত শপিং মল বা অন্যান্য আকর্ষণের বিষয়বস্তু ছিল না। তাই যে কোন অনুষ্ঠানে প্রায় সকল সদস্যই উপস্থিত থাকতো।

নতুন রূপে, নতুন কৌশলে বঙ্গীয় পরিষদে নতুন কিছু চিন্তাভাবনা নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। তখন বঙ্গীয় পরিষদে সারা বছরে তিন থেকে চারটি অনুষ্ঠান হতো। আমি ভালাম যে যদি দশটা থেকে বারোটা, অর্থাৎ মাসে যদি একটা অনুষ্ঠান করা যায় তাহলে সদস্যরা নিশ্চই আরো আনন্দিত হবে।

আমার প্রস্তাবে পরিচালন সমিতির বাকি সদস্যরা চিন্তিত ছিলেন কারণ তখন তিনটে চারটে অনুষ্ঠানের জন্য সদস্যরা অনুষ্ঠান পিছু টাকা দিতেন। আমি প্রস্তাব দিলাম এবার সারা বছরের প্রোগ্রামের জন্য এককালীন টাকা নেওয়া হোক সদস্যদের কাছ থেকে।

সদস্যদের আপত্তি ছিল কোন স্পন্সর এর মাধ্যমে টাকা নিয়ে বছরে একটি বড় অনুষ্ঠান করার, যে টাকায় সারা বছরের বাকি অনুষ্ঠানের খরচাটা বহন করা যায়। তাদের বক্তব্য ছিল নিজেদের টাকাতেই যেন সব অনুষ্ঠানের খরচা বহন করা যায়। কিন্তু এই নতুন পদ্ধতি আমরা শুরু করি এবং বঙ্গীয় পরিষদের আত্মনির্ভরশীলতার সেই সূচনা।

এরপরে ২০০৪ সালে আবার আমি পরিচালন সমিতি তে আসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে; কারণ ওই বারের পরিচালন সমিতির বাকি সদস্যরা অপেক্ষাকৃত নতুন ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অরুন বেরা, ডলি ব্যানার্জি, কেকে সান্যাল, তাপস ব্যানার্জি। এরা প্রত্যেকেই প্রচন্ড খেটে সারা বছর ধরে অনুষ্ঠানগুলোকে করিয়েছিলেন। ওই বছর আমরা চিন্তা করি যদি আমরা ভারতবর্ষের বাকি রাজ্যের যে মানুষরা এখানে আছেন তাদের আকৃষ্ট করার জন্য যদি একটা কোন মেগা প্রোগ্রাম করা যায়। 2005 সালে স্বনামধন্যাগায়িকা কবিতা কৃষ্ণমূর্তি কে দিয়ে দোহা সিনেমার মত এক ঐতিহ্যশালী প্রেক্ষাগৃহে প্রথম বলিউড মেগা প্রোগ্রাম করলাম।

সেই অনুষ্ঠান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সেই থেকে বঙ্গীয় পরিষদের প্রত্যেক বছরে যে পরিচালন সমিতি আসতো, তারা ওই ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছিল। প্রত্যেক বছরই তারা একটি মেগা প্রোগ্রাম করতেন, যাতে বলিউডের কোন স্বনামধন্য গায়ক-গায়িকা কে এনে প্রোগ্রাম করানো হতো এবং সেই প্রোগ্রামের থেকে যে টাকা উপার্জন হত সেই টাকায় সারা বছরের বাকি অনুষ্ঠানগুলোর খরচা বহন করা হতো।

কাতারে ভারতীয় সম্প্রদায়ের যে কটি সংস্থা আছে তাদের মধ্যে বঙ্গীয় পরিষদ এর পরিচিতি আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল এই মেগা প্রগ্রামের দৌলতে। অন্যদিকে এই মেগা প্রোগ্রামের দৌলতে সারা বছরের বাকি অনুষ্ঠান গুলির ব্যয়-বহনের ভারের চিন্তা আর পরিচালন সমিতিকে করতে হতো না।

এখন আগের থেকে অনেক বেশি বাঙালি বাইরে আসছে, কাতারে তার মধ্যে অনেক বাঙালি আছে আর তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য। বঙ্গীয় পরিষদ আজ কাতারের আইসিসি অধীনের যে কটি সংস্থা আছে তার মধ্যে একটি অতি পরিচিত সংস্থা, অনেক বড় এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়।

চিত্র-শিল্পী: প্রত্যুষা ঘোষ

বঙ্গীয় পরিষদের মেগা প্রগ্রাম আর বাকি অনুষ্ঠান আজ আইসিসি এবং কাতারের বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিকদের কাছে খুবই আকর্ষনীয়। এটা আমাদের খুব গর্বের বিষয় যে, যে গাছের চারা আমরা পুতেছিলাম আজ থেকে ২০-২১বছর আগে, আজকে সেই সংস্থার সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশন হচ্ছে। এটা খুব গর্বের বিষয় যে এই বছরের পরিচালন সমিতি দোহাতে উপস্থিত প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের সম্বর্ধনা করিয়েছেন ভারতীয় অ্যামব্যাসাডারকে দিয়ে। আমি আমার সঙ্গে পরিচালন সমিতি তে যারা কাজ করেছেন তাদের সঙ্গে এই সংবর্ধনাটি ভাগ করে নিতে চাই। আজ সকলের পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে এই বঙ্গীয় পরিষদের এই সফলতা। সকলে সঙ্গে থাকুন এবং বঙ্গীয় পরিষদকে আরো সাফল্যমন্ডিত করুন। আমাদের আশা যে ভবিষ্যতে বঙ্গীয় পরিষদ আরো অনেক উন্নতি করবে এবং যখন গোল্ডেন-জুবিলী সেলেব্রেশন হবে তখন অবশ্যই আশা করবো যে আইসিসির অধীনস্থ ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সবথেকে উপরে থাকবে বঙ্গীয় পরিষদ।

আমাদের কথা

যতীশ নন্দী

"আমাদের কথা" আমাদের বঙ্গীয় পরিষদের পত্রিকা। "ফিরে দেখা " টপিক এর উপর লেখা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

"আমাদের কথা" এই পত্রিকার নামকরণ সবই আমার চোখের সামনে হয়েছে, ভারী সুন্দর টাইটেল , কিন্তু আমার মনে নেই কি করে হল, কখন হলো। যাই হোক দেখি চেষ্টা করে "ফিরে কি দেখতে পাই"।

১৯৯৫ এর ২৭ অক্টোবর কাতারে আসি, কাতারে আসা, তখনকার কাতারবাসী বাঙালিদের সাথে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা এসব বলতে গেলে প্রথমেই আমার সরকারদার কথা মনে আসে। কাতার এনার্জি তথা কাতার পেট্রোলিয়াম তথা কাতার জেনারেল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর চাকরি নিয়ে এদেশে আসি। সবে এই দেশ নতুন কোম্পানির পরিবেশের সাথে পরিচিত হচ্ছি, সব কিছুতেই একটা ভয় ভয় ভাব। আমাদের সাথে এক সহকর্মী ছিল, যে আমার সাথেই এসেছিলো, যখনি আমরা কোনো কিছু আলোচনা করতাম অফিসে বাংলায় আর ঠিক সেই সময় টি-বয় চা দিতে এসেছে - ও বলতো এখন চুপ করে যান। এতটাই ভয় ভয় পরিবেশ করে দিয়েছিলো যে ওর influence-এ টি-বয় কেও ভয় পেতে শুরু করলাম। ঠিক সেই সময় একদিন অফিসে এক ভদ্রলোক নিজে থেকে এসে আলাপ করলেন, "আমার নাম অনিমেষ সরকার"। কিছুক্ষন থেকে তিনি যখন চলে গেলেন তখন যেন সব ভয় কেটে গেলো, এই নতুন দেশটা কেমন যেন অতি পরিচিত মনে হতে শুরু করলো। তারপর সরকারদার মাধ্যমে আরো অনেক বাঙালিদের সাথে আলাপ পরিচয় হলো, আরো যেন ভালো লাগা বাড়তে শুরু করলো। কাতারের কথা, ফিরে দেখার কথা লিখতে গেলে সরকারদার কথা না বললে শুরুই করতে পারি না। সেই দাদা আর আমাদের এই পৃথিবীতে নেই। সরকার দাদাকে প্রণাম না জানিয়ে এ লেখা শুরুই করে যায় না।

সত্যি বলতে বিগত ২৬ বছর ফিরে দেখতে গেলে বর্তমান সদস্যদের বিরক্ত করে ফেলবো। তাই ডিমান্ড অনুযায়ী যা মনে আসছে লিখছি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই। গত কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমি ইতিমধ্যে অল্পস্বল্প বলেওছি। তো প্রথমেই আমাদের কথা ম্যাগাজিনের উৎসাহ নিয়ে কথা বলা যাক।

প্রথমেই আসি "আমাদের কথা"-র কথায়।

যখন ঠিক হলো আমাদের কথা ম্যাগাজিন আমরা প্রকাশ করবো, ঘটনা চক্রে এই দায়িত্বটা আমি একা বহুদিন পালন করেছি। নিজে লেখা দেওয়া, অন্যের থেকে লেখা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। তখনকার দিনে বাংলায় এতো easily টাইপ করার সুযোগ ছিলো না। কোথা থেকে মনে নেই একটা বাংলা ফন্ট পেলাম। নাম "চেতনা", ডেস্কটপে ইনস্টল করে টাইপ শুরু করলাম, সেখানে যুক্তাক্ষরের বিশেষ অসুবিধা ছিলো, কিছুদিন পরে আরো একটা ফন্ট পেলাম, নাম "প্রগতি", সেখানে যুক্তাক্ষরের সুবিধা ছিল , তো চেতনা আর প্রগতি punch করে লেখা সম্পূর্ণ করলাম। শুধু নিজেরটা করলে তো হবে না , এইবার অন্য লেখক লেখিকাদের শেখাতে হবে। সেটাও হলো। কিছু সদস্য নিজেরা টাইপ করে লেখা দেওয়া শুরু করলো।

এখনো মনে আছে একটা লেখা পেয়েছিলাম পুরাণ-ইতিহাস-বর্তমানকে সাজিয়ে সুন্দর লেখা দিয়েছিলো মোনালিসা ঘোষ, ওর হাসব্যান্ড সমীরণ তখন Ras Gas -এ চাকরী করতো। ওরা মারাখিয়ার দিকে থাকতো। লেখাটা পড়ে আমার এতো ভালো লেগেছিলো, আমি মোনালিসাকে বললাম তোমার লেখাটা এত ভাল লেগেছে যে আমি বাংলায় টাইপ করার দায়িত্ব নিলাম এবারের জন্য, পরের বার থেকে তুমি নিজে টাইপ করে দেবে, দিয়েওছিলো । Honestly, Monalisa was very talented writer। আমি টাইপ করে দিয়েছি এটা জানাজানি হতে এই রকম আরো অনুরোধ আসতে শুরু করলো। সিনিয়র দাদা বৌদিদের না করতে পারতাম না। সমসাময়িকদের বা আমার চেয়ে যারা ছোট ছিলো তাদের ফন্ট সাপ্লাই করে ইনস্টল করে শিখিয়ে দিলেই কাজ মিটে যেত। আজকের আমার লেখায় হয়তো বানানের অনেক ভুল থাকবে, এখন আর অত ধৈর্য নেই, সেই সময় আমি সমস্ত বানান চেক করে সংশোধন পর্যন্ত করতাম যেমন কোথায় 'ন' হবে আর কোথায় 'ণ' হবে, কোথায় 'র' হবে কোথায় 'ড়' হবে। সমস্ত লেখা পাওয়ার পর সেগুলো প্রিন্টিং প্রেসে নিয়ে গিয়ে বসে থেকে প্রিন্ট করানো, সেটা আমার দায়িত্ব ছিল। ফান্ড ক্রাইসিস always, তাই কোন পাতাটা সাদা কালো প্রিন্ট কোনটা কালার প্রিন্ট এসব নিয়ে বেশ ভালোই কেটেছে দিনগুলো।

এবার আসি নাটকের মধুর স্মৃতিতে।

আসলে সব কিছু এতো বড় বা কর্পোরেট সাইজ-এর ছিল না বলে সবেতেই যেন একটা নিকট আত্মীয়তা অনুভব হতো।

চিত্র-শিল্পী: দীপাঞ্জন নন্দী

বঙ্গীয় পরিষদ officially ফর্ম হওয়ার আগেই বোধহয় নাটক করি, পর পর বেশ কয়েক বছর নাটকে অংশ নিয়েছিলাম। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো নাটকের রিহার্সেল। যেদিন রিহার্সেল হবে সেদিন যার বাড়ি রিহার্সেল তার বাড়ীতে রাত্রের খাবার, যথারীতি এক দুই পদের রান্না, যেন অমৃত লাগতো। সেই ট্রাডিশনটা অনেকদিন পর্যন্ত চলেছে , হয়তো বা এখনো আছে, আমি জানি না।

এবার আসি আত্মীয়তা বা আন্তরিকতার কথায়।

প্রতি বছর যখন পুরোনো কমিটি ছেড়ে চলে যেত, নতুন কমিটি আসতো , নতুন সদস্যদের পরিচয় হতো স্টেজ এ বা কেউ কাতার ছেড়ে চলে গেলে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হতো; তখন প্রায় প্রত্যেককেই বলতে শুনেছি , মাস্কাটে ছিলাম , কি আবু ধাবিতে ছিলাম, কি দুবাইয়ে ছিলাম বা সৌদি তে ছিলাম - এইরকম আত্মীয়তা কোথায় পাই নি। এটা আমাদের একটা ধরে রাখার মত সম্পদ। যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসেছেন তারা নিজেরাই বলেছেন এখানে মানুষ ডেকে নেয়, অন্যত্র গেলেও প্রবেশ নিষেধ। সকলের ক্ষেত্রে হয়তো একই অভিজ্ঞতা হবে না। এটা আমার কথা নয়, অন্যেরা যারা এখানে অন্য প্রবাস থেকে এসেছেন তাদের কথা, আমি তুলে ধরলাম মাত্র।

এবার আসি নতুন পুরাতনের সমন্বয়ের কথায়।

আমি দেখেছি খুব সুন্দর Transition হয়েছে, প্রতি বছরই। এখনকার কথা ঠিক বলতে পারবো না , কারণ আমি নিজে অনেকদিন কোনো কমিটির সাথে যুক্ত থাকিনি, তা প্রায় দশ এগার বছর হলো, তা সত্বেও অনেককেই চিনি জানি , অন্য কারোর মাধ্যমে। হয়তো সকলকে নয়। আমার মনে হয় এই মিশ্রণটা খুবই জরুরি, না হলে একটা বড় গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়। তখন অপেক্ষাকৃত পুরোনো সদস্যরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসে পরিচিত মুখ না দেখে ধীরে ধীরে ইন্টারেস্ট হারায় এবং যোগ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাই এই কাজটা বিদায়ী কমিটির একটা দায়িত্বের মধ্যে পরে, নতুন কার্যকরী সমিতির মধ্যে যথাযত সংমিশ্রণ আছে কিনা দেখার বা সেইরকম তৈরী করার প্রচেষ্টা করার।

তাই বলে কি কখনো একে অপরের প্রতি কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় নি ? নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু সেই দিনগুলো ভুলে সকলকে ভালোবেসে নতুন দিনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই যেন "আমাদের কথা" হয়ে লিপিবদ্ধ হয়। এই আমার অনুরোধ সকলকে। ভালো থেকো তোমরা।

এ পরবাসে...

জয়তী

"বঙ্গীয় পরিষদ কাতার", আজ থেকে দুই দশকের ও বেশি আগে এই মরুভূমির বুকে প্রোথিত এক স্বপ্নের নাম...

স্বপ্ন ডেকেছিলেন দূরদর্শী কিছু বাঙালি - প্রবাস জীবনের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্ন শিকড়ের বেদনা থেকে -

তাদের স্বপ্ন আজ মহীরুহে পরিণত।

কাতার-এ সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী মহলে বঙ্গীয় পরিষদ উজ্জ্বল একটি নাম - তার সংস্কৃতি চর্চায় - বৈচিত্র্যে - অনুভবে -

দীর্ঘ ২৫ বছরের এই চলার পথে , প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাই তার সম্পদ -

আজ ও মনে পরে দেড় দশকেরও আগে এই প্রবাসে পা রাখার কয়েকদিনের মধ্যেই পরম আদরে কাছে টেনে নেওয়া সেই আগ্রহী মুখ গুলোকে - পরিবার থেকে দূরে থাকার কষ্ট লঘু করার জন্য এই একান্নবর্তী পরিবার শত হাত বাড়িয়ে দেওয়া - প্রতিষ্ঠান আজও একই রকম আগ্রহী –

আজকের মতো প্রাত্যহিক ভিডিও যোগাযোগ সেদিন ছিল দূরতম স্বপ্ন -

দায়িত্ব রয়েছে আমাদের সকলের - বহু যত্নে বহু বছর ধরে গড়ে তোলা একটি ঐতিহ্যময় একটি প্রতিষ্ঠান আমাদের-

পরবর্তী প্রজন্ম কে সঙ্গে নিয়ে ভালোবাসার এই প্রতিষ্ঠানকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সদস্যদের - এই প্রবাসে, আন্তরিক ভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে ভালোবেসে- প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যর মর্যাদা রেখে -

নতুন বছরে সুস্থ পৃথিবীতে ভালো থাকার আন্তরিক শুভ কামনা জানাই তোমাদের সবাই কে...

চিত্র-শিল্পী: প্রত্যুষা ঘোষ

চিত্র-শিল্পী: মঞ্জু চৌধুরী

PAST = BABA

Sudesna Sen

Shri. Soumitri Mohan Sen became my baba at the age of 29 years. For the next 51 years I learnt innumerable things/ principles/ behavior/ attitude from him which shaped me to become who I am today. Not a moment goes by without remembering him and even in his absence my actions are governed by his standards and expectations.

My growing years were spent learning Badminton and Carrom, enjoying Sunday morning cup of Chai with the newspaper, seeing countless movies in cinema halls, picnics, overnight trips, borrowing and reading books, playing with Lego, eating everything from a roadside eatery to the 5* hotel.

The education I got through these experiences is immeasurable and was definitely an out-of-syllabus education. I also learnt to smoke from him and had my first drink with him. Through the different phases of his life, I learnt to remove the forbidden fruit out of the equation in my life, balance the do's and don'ts of life and have an open mind about everything and everyone around me.

Baba also showed and taught me through his behavior and actions the importance of responsibility, ethical living and voluntary work. He never lectured or preached and probably that is why I absorbed the good parts of him as a human being readily.

My baba was not perfect, but the good parts outweighed the bad parts definitely. For this reason, I would like him to be my baba again and again.

আমার শহর জামশেদপুর

মৌ বিশ্বাস

জন্মসূত্রে জামশেদপুরের না হলেও , এই ছোট্ট শহরটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম কিছুদিন থাকার পর থেকেই। স্বামীর কর্মসূত্রে ২০০৮ সালে পুনে থেকে যাত্রা করেছিলাম ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত এই শহরে। তখন সদ্য বিবাহিতা, একরাশ স্বপ্ন নিয়ে এই ছোট্ট পাহাড়ঘেরা সুন্দর শহরটাতে যখন এলাম তখন ভালো যে খুব লেগেছিলো তা ঠিক নয়। হয়ত মধ্য কলকাতার এক ব্যস্ত এলাকায় বড় হবার পরিবেশের সঙ্গে কোনো রকম মিল খুঁজে না পাওয়া তার প্রধান একটা কারণ হতে পারে। টেলকো কলোনির K-349 এর সেই বাড়ীটি দেখে সত্যি মনটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। "এ কেমন জায়গায় এসে পড়লাম"? তখন শুধু এই প্রশ্নই মনকে করছিলাম। কিন্তু সেই ভয়ের সমাপ্তি ঘটে অভিভাবকদের আশ্বাসে আর প্রতিবেশীদের সান্নিধে এসে। আস্তে আস্তে সেই villa-কে মনের মত করে সাজিয়ে স্বামীর সঙ্গে একসাথে পথ হাঁটা শুরু করলাম।

অপূর্ব সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশে ঘুম ভাঙত হাজার রকম পাখির কোলাহলে। উল্টোদিকেই ছিল "টেলকো ক্লাব", যেখানে প্রত্যেক সপ্তাহান্তে একটি করে সিনেমা আর রেস্তোরাঁর নৈশভোজন ছিল সাপ্তাহিক বিনোদন। তখন সিনেমা হল সেরকম ছিল না, তাই টেলকো ক্লাবই ছিল একমাত্র ভরসা। শুধু তাই নয়' এই ক্লাবে পাঠাগার, জিম, সুইমিংপুল, রেস্তোঁরা, নানারকম খেলার ব্যবস্থা ছিল। শীতকালে Flower Show, Picnic, Fairs, Book Fair, Zoo-এ যাওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জামশেদপুরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে জুবিলী পার্ক সব থেকে সুন্দর। এরমধ্যেই ছিল Zoo ,জয়ন্তী সরোবর। এ ছাড়াও ডিমনা লেক, হুডকো লেক, দলমা পাহাড় আর পাহাড়ের উপর ভুবনেশ্বরী মন্দির ছিল অতি চমৎকার। বর্ষাকালে জামশেদপুর আরও সবুজে সেজে উঠত আর সেই সময় কিছু ভয়ানক অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। সেই সময়টা অজগর, চিতি, ঢোঁড়া এইসব সাপের আনাগোনা ছিল খুব বেশি। একদিন একটু রোদে বসব বলে বাগানে যেতেই দেখি সাপ বাবাজি মহা আনন্দে রোদ পোহাচ্ছেন, আমাকে দেখে পাত্তাও দিলো না। অগত্যা আমাকেই স্থান ত্যাগ করতে হলো। একবার এক বিষাক্ত সাপ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে, তারপর তাকে বিদায় করতে "গোলমুড়ি" থেকে এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ডাকা হয়। এইরকম আরো অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল ওই ভিলাতে থাকার সময়।

দীর্ঘ পাঁচ বছর থাকার পর আবার বাক্স গুছিয়ে পাড়ি দিতে হয় নীলডিহির দলমা রোডের বাংলোতে। বাংলোতে পা রাখার সঙ্গে দুটি ছোট শিশু ছুটে এসে আমায় aunty বলে ডেকে জড়িয়ে ধরে। আমাদের out-house এ যে পরিবারটি থাকতে আসে তারই দুই পুত্র সন্তান ওই শিশুগুলো। যখন সবে shift করেছি তখন আমার বাবা, মা কলকাতা থেকে এসেছিলেন। আর এদিকে স্বামী গেছিল tour-এ। রাত্রিবেলা যখন দরজা জানলা বন্ধ করছি , হটাৎ দেখি চোরমশাই আমার জানালার নিচে চুপটি করে বসে আছে। আমি সেই দেখে পা টিপে পাশের ঘরে গিয়ে বাবার কানে বললাম। বাবা তো ডাকাবুকো লোক (পুলিশে চাকরি করতেন), চোরের কথা শুনেই দরজা খুলে চোরের পিছনে ছুট। আর চোর তখন ল্যাজ গুটিয়ে পাঁচিল টপকে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। নির্দিষ্ট সময় যখন তারা কলকাতায় ফিরে গেলো, আমার তখন সারাদিন কাটতে থাকল সেই দুই শিশুর হাঁসি, কান্না, দুষ্টামি, আবদার এইসব নিয়ে। আমার যখন সন্তান হলো, তখন সেই দেবপুত্ররা তাদের ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলো যেন আমার সন্তান তাদের ছোট ভাই। ছেলে যত বড় হাতে থাকলো, ঘুম থেকে উঠে তার দুই সঙ্গী ভাইদের খুঁজতে থাকতো, বেশ লাগতো তা দেখে। এভাবেই আমার ব্যস্তদিনগুলো কাটতে থাকলো। তারপর এই ছোট্ট শহরটাকে বিদায় জানানোর পালা চলে আসলো। সেই সময়ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীরা আমাদের পশে থেকে সমস্ত রকম সাহায্য করে শুভকামনা জানিয়ে বিদায় জানায়। আজ ছয় বছর হলো ভারতবর্ষ ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ কাতারের বাসিন্দা আমি। এখনো সকালে বাগানে বসে চা খেতে খেতে সেইদিনগুলির কথা মনে পড়ে। নিজের অজান্তে একটা হাসি ফুটে উঠে। আর মনে হয় যদি আমার সেই সুন্দর দিনগুলোই ফিরে যাওয়া যেত কত ভালো হতো।

জামশেদপুর আমার অজান্তেই কবে আমার Second Home Town (First Home Town Kolkata) হয়ে গিয়েছিলো তার উত্তর বোধহয় আজও জানা নেই। সেখানকার প্রত্যেকটি জায়গা, মানুষ, প্রকৃতি চিরমধুর স্মৃতি হিসেবে থাকবে আমার জীবনে।

কলি – কাতা

শ্রীরূপা মিত্র

আমাদের সবার প্রিয় কলকাতা, যাকে আমরা আদর করে তিলোত্তমা নামেও ডাকি, আসুন একটু খোঁজ করি সেই কলকাতার ইতিহাসের।

ফিরে যাই সাল ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে, তখন ভারতবর্ষে চলছে মুঘল রাজত্ব, নানা জাতির হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভারতমাতা তখন মুঘল সম্মানে সম্মানিত। ঠিক এমন সময় ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে পদার্পণ। এ হল সেই সময় যা বাংলার ইতিহাস কে ওলটপালট করে দেবার জন্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করছি, সেই সময় কলকাতা নামে আলাদা কোন শহর তৈরিই হয়নি।

পশ্চিমদিকে হুগলী নদী, উত্তরদিকে এক লম্বা প্রশস্ত খাড়ি এবং পূর্বদিকে আড়াই মাইল লম্বা লবণহ্রদ; তিনটে প্রশস্ত এবং বিশালাকৃতি গ্রাম, ঠিক হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থান করতো, নাম - গোবিন্দপুর, সুতানুটি এবং কালিকট। তিনটে এই গ্রাম নিয়ে কোন অসুবিধা ছিলনা, নিজের মতই তারা নিজের জায়গায় অবস্থান করত। কিন্তু গোল বাঁধল, যখন তৎকালীন পৃথিবীবিখ্যাত বৈদেশিক বানিজ্য সংস্থান, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ভারতের বিপুল প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক ধনরাশির ওপর।

১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানির তরফে জব চার্ণক, ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শানের কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বা ডিহি কলিকাতা নামের তিনটি গ্রাম কেনার অনুমতি পেলেন। সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে এই তিনটি গ্রাম কিনে নিয়ে আজকের এই কলকাতা শহরের সূচনা হল।

ইংরেজ আমলের অনেক আগে কলিকাতা ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি জল-অধ্যুষিত গণ্ডগ্রাম। সুতানুটি গ্রামের পত্তন করেন বসাক পরিবার। তাদের ছিল সুতোর কারবার। সপ্তগ্রাম থেকে সুতানুটিতে ষোড়শ শতকের শেষে কিংবা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে এসে তাঁরা এখানে সুতার হাট বসাতেন। সুতা বিক্রি হতো নুটি বা লুটি হিসেবে। সেই থেকে নাম সুতানুটি।

গোবিন্দপুর গ্রাম পত্তন করেছিল শেঠ পরিবার। তাঁদের গৃহ-দেবতা গোবিন্দ জীউ এর নামে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর।

এইসব নামকরণ নিয়ে খুব একটা বিবাদ-বিতর্ক নেই। যত্ত গোল এই কলিকাতা নাম নিয়েই। কেউ বলেন কিলকিলা থেকে তো আবার কেউ বলেন কালীঘাট থেকে। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, ভাষার বিকৃতিও একটা ব্যকরণ মেনে চলে। কিলকিলা বা কালীঘাট থেকে 'কলিকাতা' নাম আসাটা বেশ কষ্টকর। তেমন জোরালো কিছু যুক্তিও নেই।

তার থেকে বরং অনেক বেশি যুক্তি আর তথ্য-প্রমাণ আছে সাহিত্য বাচস্পতি, পদ্মবিভূষণ - ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত সুনীতিবাবুর বক্তব্যে। সুনীতিবাবুর কথায় - "কলিকাতা" একটা খাঁটি বাংলা শব্দ। 'কলি' মানে চুন, কলিচুন । আর 'কাতা' মানে গ্রাম্য বাংলায় শামুকপোড়ার আড়ত। সুতার নুটির হাট থেকে যেমন সুতানুটি হয়েছে, কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত কিংবা শামুক পোড়ানোর কারখানা থেকেই হয়েছে 'কলিকাতা' নাম।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের সপক্ষে জোরালো যুক্তি এবং তথ্য-প্রমাণ আছে।

কলকাতার সঙ্গে কলিচুন বা চুনের সম্পর্কের একটা প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। সিমস সাহেবের প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্ট থেকে। সিমস সাহেবের তথ্য অনুযায়ী সেইসময়ের ডিহি কলিকাতার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি রাস্তা এবং এলাকার সঙ্গে যোগ ছিল এই চুন এর। ডিহি কলকাতার উত্তরের দুনম্বর ব্লকে ৭২২ ফুট বাই ১৭ ফুট একটি রাস্তা, যার নাম ছিল চুনাপুকুর লেন, ব্লক নম্বর তিন-এ ৭৭০ ফুট বাই ২৩.৪ ফুটের রাস্তা চুনাগলি আর ব্লক নম্বর চার-এ ৯২০ ফুট বাই ১৪ ফুট এর রাস্তা চুনারপাড়া লেন। এখন যেখানে স্ট্র্যাণ্ড রোড, তখন এই জায়গার ওপর দিয়েই বইতো হুগলী নদী। আর চুনারপাড়ার অবস্থান ছিল এর খুব কাছেই। মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়ার জন্য বলছি, এই তিনটি ব্লকের সীমানা ছিল উত্তরে আজকের কলুটোলা স্ট্রীট, দক্ষিণে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি বা বহুবাজার স্ট্রীট, পূর্বে সার্কুলার রোড আর পশ্চিমে লালবাজার। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগেও এই অঞ্চলে চুনারীদের বসবাস ছিল। কলিকাতা যেহেতু এক সময়ে সমুদ্রের তলায় ছিল, আর কলকাতার প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক রূপ অন্যরকম ছিল তাই কলিচুন তৈরির প্রধান উপাদান শামুকও পাওয়া যেত প্রচুর, কলকাতা আর তার আশেপাশে। বাংলায় তখন পাথুরে চুনের প্রচলন শুরু হয় নি। তাই এই কলিচুনের চাহিদাও ছিল ব্যাপক। পরবর্তীকালে সস্তা পাথুরে চুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়ে যায় কলিচুন তৈরির এই কুটিরশিল্প। চুনারীরাও জীবিকার্জনের সংগ্রামে কোণঠাসা হয়ে বেছে নেয় অন্য জীবিকা।

চিত্র-শিল্পী: অনুশা কর

সুনীতিবাবুর এই কলিচুন এর কাতা থেকেই কলিকাতা — এই মত কে সমর্থন জানালেন বিনয় ঘোষ ও। বিনয় বাবু বিশ শতকের একজন বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক, সাহিত্যিক, লোকসংস্কৃতি সাধক, চিন্তাবিদ ও গবেষক। এর স্বপক্ষে বিনয়বাবু যা প্রমাণ দেখালেন, তারপরে এই নিয়ে তর্ক করাটা নিতান্তই অযৌতিক। কি প্রমাণ দেখালেন বিনয় ঘোষ ?

১৯৫২ সালে বিনয় ঘোষ এই শহর থেকে মাত্রই ৫০/৬০ কিমি দূরে একটি পাখি ডাকা ছায়াঘেরা গ্রাম আবিষ্কার করেন যার নাম কলিকাতা। অবাক হয়ে বিনয়বাবু খোঁজখবর শুরু করে দেন। দলিল-দস্তাবেজ, সেটেলমেন্টের কাগজেও কিন্তু এই গ্রামের নাম লেখা কলিকাতা । আড়াইশো বছরের বেশি পুরানো একটি মন্দির আছে এই গ্রামে। সেই মন্দিরের গায়েও কিন্তু কলিকাতা নামটিই লেখা। দোকান বাজারের সাইনবোর্ডেও বেশিরভাগ জায়গাতেই তখন লেখা ছিল কলিকাতা। হাওড়া জেলার পশ্চিমদিকে দামোদরের গা-ঘেঁষা একটি সমৃদ্ধ জনপদের নাম রসপুর । সেই জনপদেরই একটি গ্রামের নাম কলিকাতা । এই ছোট্ট গ্রামটিকে আজ ও "ছোট কলিকাতা" নামেই ডাকে আশেপাশের মানুষ। হাওড়ায় ও চব্বিশ পরগনায় খুব কাছাকাছি এলাকার মধ্যেই কলিচুনের কাতার এর নামে কলিকাতা পরিচয়ে অন্ততঃ দুটি গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। হাওড়ার কলিকাতা গ্রামটি আজও তার নীরব সাক্ষী হিসেবে টিঁকে রয়েছে। 'কলিকাতা' নামের উৎস সম্পর্কে সুনীতিবাবুর ব্যাখ্যার সঙ্গে এই কলিকাতা গ্রামের নামের গল্প হুবহু মিলে যায় সেই ব্যাখ্যা। বিনয়বাবুর সন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ আর খোঁজখবরে বেরিয়ে এলো এই গ্রামের নামকরণের ইতিহাস। একসময়ে নাকি খুবই সমৃদ্ধ ছিল রসপুরের এই কলিকাতা গ্রাম। দামোদরের তীরে এই অঞ্চলটি ছিল কলিচুন তৈরি আর তার বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বয়স্ক বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিনয়বাবু জেনে এসেছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও এই গ্রামে প্রচুর মানুষ যুক্ত ছিলেন এই কলিচুন তৈরি ও বিক্রির জীবিকার সঙ্গে। বিনয় ঘোষের এই প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ফলেই সুনীতিবাবুর 'কলিচুন এর কাতা' থেকেই কলিকাতা মতবাদটি দৃঢ় হয়। কালিঘাটের কালী থেকে নয়, কলিচুনের কাতা থেকেই নাম এই কলিকাতার। ইংরেজদের বদান্যতায় হুগলী নদীর পূর্বদিকের কলকাতা আজ 'সিটি অফ জয়' আর নদীর পশ্চিমপাড়ের কলিকাতা আজও অখ্যাত অবহেলিত একটি গ্রাম।

যাইহোক, প্রাচীন খালে, জলে এবং খাড়িতে ঘেরা কালিকট বন্দরের ইংরেজ শাসনের সময় দেওয়া এই 'কলিকাতা' নাম অতিশয় তাৎপর্যপুর্ণ।

জব চার্ণক নামক জনৈক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশিষ্ট প্রতিনিধি ১৬৯৮ সালে ঐ তিনটে বিশেষ গ্রাম কিনে ফেলেন স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে, ভারতবর্ষের বুকে ব্রিটিশদের ব্যাবসার ঘাটি গাড়বার জন্যে। কিন্তু তাও শেষরক্ষা হয় না, মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব সিরাজ-উদ-দুল্লা বিদেশীদের এই লোভনীয় ঘাটি আক্রমণ করেন এবং জিতে নেন। আবার ১৭৫৭ সালে কলকাতার হাতবদল হয় সিরাজ-উদ-দুল্লা থেকে ইংরেজদের হাতে, বিশিষ্ট ইংরেজ শাসনকর্তা স্যার রবার্ট ক্লাইভ এর সাহায্যে। ইংরেজদের পুরো ভারতবর্ষ জয়ের পর ১৯১২ সাল থেকে স্বাধীনতা অব্দি এই কলকাতা বন্দর ছিল ভারতের এবং ভারতীয় ব্রিটিশদের প্রধান শহরবিশেষ এবং রাজধানী, যেখান থেকে তাঁরা আগাগোড়া সমগ্র দেশকে

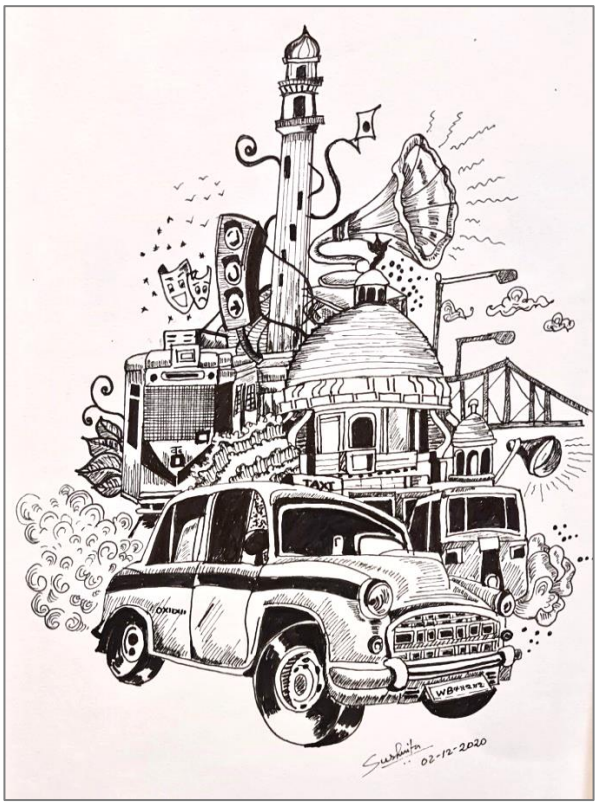

চিত্র-শিল্পী: সুস্মিতা দাশগুপ্ত

শাসন এবং শোষণ করে গেছেন।

শাসন ও শোষণ ছাড়াও এই সময়সীমার মধ্যে এই বিদেশী জাতি নিজেদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের কাঠামোগত ও সংস্কৃতিগত অনেক উন্নয়ন করেছেন। এই উন্নয়নের ঐতিহ্য বাংলার মাটি আজও বহন করে চলেছে বিভিন্ন স্মৃতি সমারত, মনুমেন্ট সমূহের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হুগলী নদীর ধার ঘেঁষে অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম হল এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন এবং গুরুত্তপুর্ণ। ইংরেজদের বাংলায় জমি কেনার পরবর্তীকালেই এই দূর্গ তৈরীর কাজ শুরু হয়ে আবার বাধাপ্রাপ্ত হয় নবাব এর কলকাতা আক্রমনের সময়। হাতবদল হবার পরে এর কাজ আবার নতুন করে শুরু হয় এবং একই সঙ্গে পুরোনো দূর্গ সারানোর কাজও শুরু হয়। এই জায়গা বর্তমান কলকাতার বিশেষ দর্শনীয় স্থান গুলির মধ্যে একটি। প্রাচীন এই দুর্গ আজ কলকাতার বুকে সবুজ ঘাসে ঘেরা এক ঐতিহ্যপুর্ণ ভবন হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে,যা বিভিন্ন ভ্রমণকারীর মনে আজও বিস্ময়য়ের উদ্রেক করে। এমন আরো অনেক স্থাপত্য ছড়িয়ে রয়েছে শহরের আনাচে- কানাচে।

কলকাতা শুধুমাত্র একটা শহর, নগরী বা বাংলার রাজধানী নয়, এ এক আশ্চর্য অনুভূতি, যা যে কোন স্বদেশী সংস্কৃতিতে এবং প্রবাসী বাঙালীর বিদেশে বসে কফির আড্ডায় হওয়া কলকাতা নিয়ে আলোচনার সময় চোখের ভাষায় উদ্ভাসিত হয়। কলকাতা হল একধরনের নস্টালজিয়া, যা আপামর বাঙালীর শিরায়, রক্তে ধমনিতে প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয়। কলকাতা মানে কিছু বিশেষ জায়গা, কিছু বিশেষ ব্যাক্তিত্ব, কিছু বিশেষ খাবার, কিছু ঐতিহ্য, কিছু বিশেষ ধরনের সম্পর্ক।

আরও একজন মানুষ আছেন যিনি শুধুমাত্র বাংলার ঐতিহ্যের অংশই নন, বিশেষ কিছু সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তাও বটে। ইনি হলেন পৃথিবী বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি অবশ্যই বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবি ঠাকুরের গান, কলকাতার রসগোল্লা, মাছের ঝোল অন্যান্য অনেক জাতির কাছে কলকাতার অন্যতম পরিচয়গুলির মধ্যে অন্যতম। রবি ঠাকুর শুধু সাহিত্যচ্চর্চাই করেননি, তিনি সাহিত্য পুজার মাধ্যমে কলকাতা ও বাংলার সন্মান কে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জোড়াসাঁকো তে অবস্থিত বিশ্বকবির বাসস্থান যা বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা এবং কলকাতার এক ঐতিহ্যপূর্ণ দর্শনীয় স্থান।

নোবেলজয়ী এই কবি হলেন আন্তর্জাতিক স্তরে কলকাতার মুখ, কলকাতার পরিচয়েই রবি ঠাকুরের পরিচয় বা একটু অন্য ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় কবিগুরুর পরিচয়েই কলকাতার পরিচয় । এই দুই-ই হল একে অপরের পরিপূরক।

কলকাতার স্মৃতির থেকেও বড় কথা হল কলকাতা নিজেই একধরণের স্মৃতি যাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন । বাঙালী মুম্বই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর কিংবা বিদেশ যেখানেই থেকে থাকুক না কেন, নিজের শিকড়কে কিছুতেই উপড়ে ফেলতে পারেনা। সেই পত্তনের কাল থেকে এই শহর নিজের ঐতিহ্যকে পালন করে চলেছে, সংস্কৃতির বীজকে ও স্মৃতিকে লালন করে চলেছে। আর তাই আজ ও বাঙালী এই ভারতবর্ষের নানা জাতির মধ্যে থেকেও নিজেকে একটু আলাদা করে নিতে পেরেছে । বাঙালী তাই আজ কলকাতার মাটি থেকে বেড়িয়েও সব জায়গায় সন্মানিত এবং পূজিত। আর তাই দেশে, বিদেশে, বিশ্বব্রহ্মান্ডে আজ ও ছাপ রেখে চলেছে আমাদের স্মৃতির শহর কলকাতা।

তথ্যঋণ : ১. কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ২. কলকাতার কড়চা, বিনয় ঘোষ

ঝিলপাড়, মাচা, শহর এবং EINSTEIN

উৎপল মন্ডল

সময় খুবই জটিল এবং রহস্যময় বিষয়। সাহিত্য ও সিনেমায় ফেলে আসা সময়কে ফিরে পাওয়া বা টাইম মেশিনে করে অতীতে সহজেই ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু আজকের সময়ে এখনো এটা অসম্ভবই। জীবনের স্ক্রিপ্টটা "Dark" নয় যে কোনো টানেল দিয়ে আপনি অতীত বা ভবিষ্যতে পৌঁছে গেলেন। আইনস্টাইনের "Theory of Relativity" তে Time Dilation-এর কথা বলা আছে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পর যখন লাইটস্পীডে খুব সহজেই কাছেপিঠের কোনো গ্রহ বা নক্ষত্র থেকে ঘুরে আসা যাবে, শুধুমাত্র এই Time Dilation থাকার জন্য আপনি চাইলেও কোনো এক শীতের বিকালবেলা হটাৎ করে Proxima Centuri থেকে ঘুরে আসতে পারবেন না। কারণ আপনার পরিপ্রেক্ষিতে 1 সেকেন্ড যাত্রা সময় পৃথিবীতে থাকা কারোর রেফারেন্সে 4টে বছর।

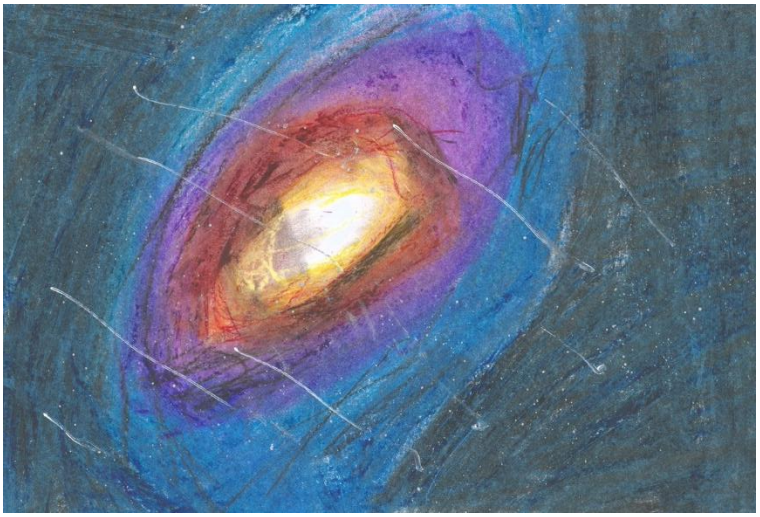

চিত্র-শিল্পী: ভিহান রায়

তখনো আইনস্টাইনকে ভালো করে জানা হয়ে ওঠেনি। তখনো জীবনে "weekend" আসেনি। বছর 15 আগে কোনো এক গ্রীষ্মের সকালে সেখানে প্রথম প্রবেশ। মেইন গেটটা এখনের মতোই বন্ধ থাকতো আর পাশে একটা ছোট্টো মতো গেট দিয়ে ঢুকতে হতো। না, কোনো Narnia বা Harry Potter এর জগতে ঢুকে পড়ার মতো অনুভূতি বোধহয় কারোর-ই হতো না এখানে এসে। তবু একধরনের মুক্তির স্বাদ আজো গেলে পাওয়া যায়। গেটের ভিতর আর বাইরের দুটো দুনিয়া যে কতটা আলাদা সেটা যারা ওই গেট দিয়ে একেবারের জন্য বেরিয়ে গেছে তারাই ভালো জানে। গেট দিয়ে ঢুকে ডানদিকে ক্যান্টিন আর বামদিকে একটা রাস্তা সোজাসুজি গিয়ে শেষ হয়েছে ডিপার্টমেন্টে। ক্যান্টিনটা অনেকের জন্যই ব্ল্যাকহোলের মতো ছিলো। যার মধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে পদার্থ তো দূরের কথা আলো-ও বেরোতে পারে না। সকালবেলা ক্লাস করতে এসে যারা প্রথমে বামদিকের রাস্তাটা ধরতে পারতো না, তাদের মধ্যে অনেকেই সারাদিনের জন্য ক্যান্টিনের ব্ল্যাকহোলে আটকে যেতো। এরকম ব্ল্যাকহোল পুরো চত্বরে অনেক জায়গায় ছিলো আর ছিলো অফুরন্ত একটি জিনিস যেটি সবাই খেত, খুবই ভালো পরিমানে এবং ফ্রিতে। ল্যাদ।

আমরা যারা জীবিত তারা কি কখনো ভাবি মৃত্যুর কথা? কখনো ভাবি কেমন করে একটা মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে সবকিছু? কোনো এক শুন্য থেকে যাত্রা শুরু করে কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে আবার সেই শুন্যে মিশে যাওয়া। Orhan Pamuk এর লেখা থেকে ধার করে বলতে হয় " Before my birth there was infinite time, and after my death, inexhaustible time. I never thought of it before: I'd been living luminously between two eternities of darkness." . না ভাবিনা। হয়তো ভাবি কিন্তু অনুভব করতে পারি না। 15 বছর আগে যেদিন ঢুকেছিলাম সেখানে, কখনো কেউ ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে । 4টে বছর তো শুধু মুখের কথা নয়, অনেকটা সময়। ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও এখনো যখন সন্ধেবেলা সামনের মাঠের ধারে সবাই মিলে বসে গল্প করে, এক না একবার তারা ভাবেই এই মূল্যবান সময় একদিন শেষ হয়ে যাবে। সত্যিই কি শেষ হয়ে যাবে? The Time Traveller's Wife-এর একটা quote মনে পড়ে যায়। "We laugh and laugh, and nothing can ever be sad, no one can be lost, or dead, or far away: right now we are here, and nothing can match our perfection, or steal the joy of this perfect moment". অনেক দিন পর কোনো এক দুরদেশে অফিসে বসে তাদের মধ্যে কেউ Linkedin স্ক্রল করতে করতে সেই পুরানো চেনা মুখের দেখা পায়,

তখন মনে পড়ে এরকম একটা সময় সত্যিই কি ছিলো না কি সবই ভ্রম?

ডিপার্টমেনট থেকে বেরিয়ে বামদিকে গেলে চৌমাথা, তার পাশেই ইউনিয়ন রুম। সেখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে বড় লাইব্রেরির দিকে। অন্যটার পাশে ছোটোমতো কিরানা। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতা, পেন, বই ইত্যাদি একটু বেশি দামেই পাওয়া যেত। তবে এখন আমরা ওই রাস্তাদুটোর কোনোটাই ধরব না। বাঁদিকে বিশাল মাঠটাকে রেখে এগিয়ে যাবো সামনের দিকে। রাস্তার যেদিকটা মাঠ, সেখানে সারিসারি বেশ কয়েকটা বড় গাছ যার বেদীগুলো বাঁধানো। আর অন্যধারে একটা বিল্ডিং-এর প্রবেশমুখ। যার নামে এই ভবনের নামকরন, তাঁর ভাবনার সঠিক মর্যাদা দিয়ে অনেক আন্দোলনের শুরু ও শেষ সেখানেই হতো। আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁক ধরে হেঁটে গেলে ডানপাশে পড়ত বড় ঝিল। ঝিলপাড়ের বাঁধানো ঘাটটা ছিলো আরো একটা ব্ল্যাকহোল। আর তার একটু আগে উঁচু লোহার প্লাটফর্ম যেখানে তিন চারজনে আরামসে বসা যেত। সবাই বলত মাচা।

চিত্র-শিল্পী: শ্রীপূর্ণা বাচস্পতি

Mindfulness Meditation-এর একটি technique হোল নিজের চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করা। সারাদিন আপনার প্রচুর চাপ গেছে অফিসে। পরের দিন সকাল সকাল আবার গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। ওদিকে দেশে ফোন করে জানতে পারলেন বাড়িতে বাবা-মার শরীরটা ভালো যাচ্ছেনা। ছেলের স্কুলের রেজাল্টটা ভালো হয়নি। এসব নানাকারনে রাতের ঘুম পুরো কাহিল। ঠিক এই সময় আপনি mindfullness চেষ্টা করতে পারেন। মন অনেকটা ব্যস্ত রাস্তার মতো। অনবরত গাড়ি চলছেই। আর আপনি corniche-এর অন্যধারে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছেন। সামনে সমুদ্র। মাঝখানে রাস্তা। এই গাড়িগুলো এক একটা চিন্তা। একটার পর একটা আসছে। ওইযে সাদা LandCruiser ওটা আপনার একটা মন ভালো করা চিন্তা। তার পিছনে ছোট কালো গাড়িটা একটা দুশ্চিন্তা। কিন্তু আপনি জানেন ওই দুটোর কোনটাই আপনার নিজের নয়। আপনার গাড়ি কাছের মেট্রো স্টেশনে পার্ক করা আছে। আরো কিছুক্ষন রাস্তা দেখুন। কিছু সময় পর দেখবেন রাস্তাটা আপনার মনে কোনো প্রভাব ফেলছেনা। রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি আসছে যাচ্ছে। কিন্তু সামনের সমুদ্রের নীল জলে চোখ আটকে গেছে আপনার।

মাচা ছিলো সেই সময়ের Mindfullness-এর রাস্তা। পরীক্ষায় সাপ্লির চিন্তা হোক, ক্লাসেটেস্টের কম নম্বর বা Structure-এর কোনো জটিল সমস্যার সমাধান সবকিছুর উত্তর খোঁজার অন্যতম সেরা জায়গা এটা। মাচার birds-eye ভিউতে বসে এসব সমস্যাগুলো কোনো সমস্যা মনে হতো না। বেশ কয়েক বছর আগে যখন গেছিলাম, মাচার দেখা আর পাইনি। অনেক কিছুর মতো ওটার বাস এখন স্মৃতিতেই। মুষলধারে বৃষ্টির দিনগুলোয় ক্যাম্পাসের চেহারা পুরো পাল্টে যেতো।। বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো এই ভেজা মাঠ, প্রাচীন সব মহীরুহ বা এই ঝিল এক ব্যস্ত শহরের অংশ। গত ঝড়ে লাইব্রেরির সামনের বিখ্যাত ভাস্কর্যগুলো ভেঙ্গে পড়েছিল। জানিনা সেগুলো আর আছে কিনা। এরকম কত ঝড়ে টুকরো টুকরো কত স্মৃতি ভেঙ্গে যায়। কে তার খবর রাখে।

লেখার শুরুতে বলেছিলাম Time Dilation নিয়ে। ফেলে আসা প্রত্যেকটা ভালো সময়ই Time Dilation-এর উদাহরণ। কিভাবে যে শেষ হয়ে যায় জীবনের এক একটা স্টেজ। লাস্ট সেমিস্টার বা শেষ ক্লাসের দিনেও কারোর এসব নিয়ে ভাবার সময় হয়না। Viva-র টেনশন থাকে। নতুন চাকরিতে জয়েন করার প্রস্তুতি। উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি লাগানো অন্য টাইম-জোনে। ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যায় সবকিছু। চেনা সম্পর্ক গুলোয় দূরত্বের ধুলো লাগে। এইট বি-র বাসস্ট্যান্ড ঢেকে থাকে ঘন কুয়াশাতে। শুন্যতা গ্রাস করে সকালের ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থেকে মনে। দোহা থেকে ডাবলিন, আটলান্টা থেকে অকলেন্ডে বয়ে যায় মনখারাপের বাতাস। অনেকবছর পর বিমান নামে প্রিয় শহরের বুকে। ছোটো ছোটো গেট-টুগেদারে আবার দেখা হয়ে যায় পুরানো সেই মুখগুলোর সাথে। একপলকেই সময়গুলো কোথাথেকে যে চলে যায়। সিটবেল্ট বাঁধতে হয় আবার। রানওয়ে চিরে উঠে পড়ে মানুষ,লাগেজ আর মনখারাপ। জানলা দিয়ে আর একবার দেখে নিতে হয় ঝলমলে শহরটাকে। এবারের মতো বিদায়।

"These legends,' murmured Pizarro, 'which of us can say if they're true or not? So many memories come to as though from out of the fog. Sometimes I wake up in the morning convinced that I'm in my village in my beloved Extramadura, making a bell, absolutely sure that that's what I've done all my life. Then I remember where I am, and what I've seen, and I become old again." — Antoine B. Daniel, Incas: The Light of Machu Pic

হে অতীত, কথা কও

মৃদুছন্দা সিনহা

১৫ই ফেব্রুয়ারি,২০১৯। মুম্বাইয়ের একটি নামী কর্পোরেট হাউসের কর্মব্যস্ত অপরাহ্ন। তিনজন ব্যক্তি মগ্ন 'কোম্পানি স্কুল পেইন্টিং' (ভারতীয় চিত্র শৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা) এর উপর একটি প্রামাণ্য ক্যাটালগ প্রকাশের শেষ পর্যায়ের কাজে। তিনজনের একজন বিদগ্ধ আর্ট হিস্টোরিয়ান ডক্টর জেরেমিয়াহ পি. লসটি যিনি জেরি লসটি নামে বেশি পরিচিত এবং ভারতীয় শিল্পকলার চর্চায় যার অবদান বিশ্ববিশ্রুত। দ্বিতীয়জন আমার বস, মিসেস শিল্পা শা আর তৃতীয়জন অতি অকিঞ্চিৎকর আমি। চা-বিরতির স্বল্প পরিসরে হালকা কথায় ফিরলেন ডক্টর লসটি। কথাপ্রসঙ্গে মিসেস শা জানালেন এটাই ওনাদের সাথে আমার শেষ প্রজেক্ট কারণ আমি মুম্বাই থেকে ঠিকানা বদলে কাতারবাসী হতে চলেছি।প্রফেসর উজ্জ্বল চোখে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "গ্রেট! দেয়ার উইল বি গুড অপরচুনিটিস। কাতার ইজ নাউ ইনভেস্টিং ইন এ বিগ স্কেল ইন আর্ট এন্ড আর্ট রিলেটেড ভেঞ্চারস। উড লাভ টু সি ইউ দেয়ার ইফ উই ভিজিট কাতার ফর এনি ফিউচার প্রজেক্ট।" ডক্টর লসটি গত হয়েছেন ২০২১ এ আর আমি ২০১৯ এ এখানে এসে কর্ম বিরতি নিয়েছি।

কোন কোন অলস দুপুরে নিজেকে ফিরে দেখতে গেলে ভেসে ওঠে বিগত ১৮ বছরের কর্মজীবনের কোলাজ যার অনেকটা জুড়ে আছে নানা বিষয়ে গবেষণা, বিভিন্ন প্রদর্শনীর তত্ত্বাবধনা (কিউরেটিং এক্সিবিশন) এবং বহু জ্ঞানী-গুনি জনের সান্নিধ্য। আমার এই লেখা শুধু নিজেকে ফিরে দেখা নয়, আমার অতীতের আয়নায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোন শিল্প- সাহিত্য-বিজ্ঞান অনুরাগী যদি নিজের উৎসাহী মুখচ্ছবি দেখতে পায়, তবেই এই লেখার সার্থকতা।

আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন একটি ব্যতিক্রমী বিষয়ে - মিউজিওলজি বা সংগ্রহশালা বিজ্ঞান। নব্বইয়ের দশকে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরে মিউজিওলজি নিয়ে ভর্তি হই তখন এই বিষয়ের কথা বললে বেশিরভাগ লোকজন বিস্ময়-এ তাকাতেন। আমার অনুমান হয়তো ভুল নয় যে এখনও বহু জনের কাছেই বিষয়টি সম্পূর্ণ অজানা। যদিও ভারতে সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের চর্চা বেশ পুরনো। ১৯৫৮ সালে স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি ডিপার্টমেন্ট যা ভারতে প্রথম। এরপর বিভিন্ন সময়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (B.H.U), মহারাজা সায়াজিরাও ইউনিভার্সিটি অফ বরোদা, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, দিল্লি প্রমুখ ইনস্টিটিউট এ মিউজিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়, যেখান থেকে স্নাতকোত্তর প্রাপ্ত বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বিশিষ্ট পদে কর্মরত আছেন। মিউজিয়াম পরিচালনা, পুরাতত্ত্ব বা আর্কিওলজি, নৃতত্ত্ব বা অ্যানথ্রোপলজি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা, জনসংযোগ বা পাবলিক রিলেশন, বিভিন্ন ধরনের এক্সিবিশনের আয়োজন এবং সর্বোপরি সমস্ত ধরনের ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এর বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ (কনজারভেশন অ্যান্ড প্রিজারভেশন) - সবই একজন মিউজিওলজিস্ট এর কাজের আওতায় পড়ে।

আজকে বহুমুখী ব্যস্তসমস্ত জীবন আমাদের। এই জেট গতির জীবনে যেখানে শুধুই এগিয়ে চলা লক্ষ্য সেখানে অতীতের সীমারেখায় স্থিত ঘটনা এবং তারসাথে জড়িয়ে থাকা বস্তু সামগ্রীর পর্যালোচনার কি প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে? আছে, ভীষণভাবে আছে। আগামীর সব তারগুলোই কি অতীতের কাছে বাধা নেই? যে পরম যত্নে আমরা আমাদের প্রপিতামহ/মহীর কাছ থেকে বংশপরম্পরায় হাত বদল হওয়া বহুমূল্য অলংকার বা বেনারসি শাড়িটিকে আগলে রাখি, সেভাবেই একটি জাতির বা দেশের সময়পরম্পরায় ঘটে যাওয়া সুখ দুঃখের গল্পকে নিজের গৃহকোণে সঞ্চিত রাখে সংগ্রহশালা। আগামীর সন্তান যাতে নিজের শিকড়কে ছুঁয়ে দেখতে পারে। মানব প্রজন্ম তথা সমগ্র বিশ্বজগতের জাগতিক - মহাজাগতিক ইতিহাসের গল্প বলার জন্য মিউজিয়ামের থেকে বড় 'কথক' আর কে আছে?

রবীন্দ্রনাথের থেকে ধার করে বলি,

"তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্তৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।"

আমাদের শহর দিনহাটা

ধৃতিমান রায়মন্ডল

দোহাতে দেখতে দেখতে দশ বছর কাটিয়ে দিলাম, বরঞ্চ বলি সমৃদ্ধ হলাম নানা ভাবে। কাতারে বঙ্গীয়-পরিষদ আমাদের পরিবার একটি বিরাট ভরসা, ভালোবাসার জায়গা। আমাদের জন্য বঙ্গীয় পরিষদ মরুভূমিতে এক সুন্দর শীতল মরুদ্যান। বঙ্গীয় পরিষদ আমাদের সবসময়েই শেকড় এর সাথে জুড়ে থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

অনিন্দিতা ও আমি দুজনেই দিনহাটা থেকে উঠে আসা, পড়াশুনোর প্রথম পাঠ দিনহাটাতেই, মা বাবার শহর দিনহাটা। আমরা সবসময়ই দিনহাটার থেকে দূরে থেকেও আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকি, যাকে এক কথায় বলতেই পারি "always carry a part of Dinhata with us"।

আমার লেখার অভ্যেস বা ক্ষমতা দুটোই নেই, কিন্তু "আমাদের-কথা" তে দিনহাটা সম্বন্ধে লেখার পরিসর পাওয়ায় লোভটা সামলাতেপারলাম না। যদিও স্বাভাবিক ভাবেই উত্তরবঙ্গ বলতে আমরা সবাই দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্সের কথাই মনে করি। আজকে আপনাদেরকে উত্তরবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত শহরের গল্প শোনাই, ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বন্ধে।

দিনহাটা, এই ছোট্ট মিউনিসিপালিটি শহরটি, কুচবিহার জেলার একটি মহকুমা। সন-তারিখের দিক থেকে বিচার করলে নাকি জনপদহিসেবে দিনহাটা কুচবিহারের থেকেও প্রাচীন। জেমস রেনেল নামের এক ইংরেজ সার্ভেয়ার জেনেরাল তাঁর মানচিত্রে দিনহাটার

নাম লিখেছেন 'দিন্নাহাট্টা' (Dinnahat-ta)। রেনেল ভারতবর্ষে আসেন ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পরেই রেনেল বাংলার প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল পদে নিযুক্ত হন, এবং পরবর্তী বছরে এই অঞ্চলের নদ-নদীর গতিপথ খুঁজে মানচিত্র তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র সংলগ্ন এলাকা থেকে রংপুর পর্যন্ত জরিপের কাজ শুরুকরেন।

দিনহাটা মহকুমার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন গুলোর কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় জেলার প্রাচীনতম প্রত্নক্ষেত্র 'রাজপাট ঢিপি'র কথা। মহকুমা সদর দিনহাটা থেকে ১২.৮ কিলোমিটার পশ্চিমে গোসানিমারি অঞ্চলে এই রাজপাট অবস্থিত। এই স্থানটি, বর্তমানে Archaeological Survey of India (ASI) তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং ভারত সরকার এই 'রাজপাটঢিপিটিকে' 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সম্ভবত 'রাজপাট' শব্দটি 'রাজপ্রাসাদ' থেকে এসেছে। এটি ছিল আনুমানিক চতুর্দশ - পঞ্চদশ শতকের 'কামতা' রাজ্যের রাজধানী, কামতাপুরের নগরদুর্গ। পাল ও সেন বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করেছেন। এখানকার রাজাদের উপাধি ছিল কামতেশ্বর বা কান্তেশ্বর এবং প্রায় ১৪ জন রাজা বংশানুক্রমে এখানে রাজত্ব করেছেন। একসময় নাকি এখান থেকেই শাসন করা হত ভারতের বিস্তীর্ণ এক ভূ-ভাগ এবং এর দীর্ঘকালীন সীমানা ছিল – পশ্চিমে করতোয়া নদীথেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তরের ভুটান থেকে দক্ষিণের বগুড়া জেলা পর্যন্ত। ঠিক কি কারণে রাজপ্রাসাদটি এখন প্রায় ৫০ ফুট মাটির ঢিপির নীচে তা জানা যায় না তবে ১৯৯৮-২০০০ সালে ASI এখানে একটি ছোট্ট অংশ খুঁড়ে বিশাল ইটের প্রাচীর, দুটি

পাতকুয়া, পাথর দিয়ে তৈরি সৌধের ধ্বংসাবশেষ, একটি পুকুর, প্রলম্বিত দেওয়ালের ভিত ইত্যাদি খুঁজে পায়। এগুলি সম্ভবতঃ নবম-দশম থেকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের তৈরি। এছাড়াও পাথর এবং পোড়ামাটির দেবদেবী ও জীব-জন্তুর মূর্তি, ফলক, সুলতানি আমলের রৌপ্য মুদ্রা ইত্যাদি এখানে পাওয়া গিয়েছে এবং একটি স্থানীয় সংগ্রহশালায় রাখা আছে। এগুলো পাল-সেন যুগের ভাস্কর্য ও শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করা

হয়। এখানকার সর্বশেষ রাজা ছিলেন নীলধ্বজ বা কান্তেশ্বর। রাজা নীলধ্জ গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের আক্রমণ কে দুবার প্রতিহত করলেও তৃতীয় বারে নিজের মহামন্ত্রীর চক্রান্তে পরাজিত হন ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং একটি সুপ্রাচীন রাজবংশের পতন ঘটে। গোসানিমংগল নামের একটি কাব্যে এই ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। নীলধ্বজের পরাজয়ের প্রায় সাথে সাথেই কুচবিহারের রাজত্বের সূচনা হয় এবং কুচবিহার কামতাপুরের, উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জনপদে পরিণত হয়। প্রসঙ্গতঃ, কামরূপ এবং কামতাপুর কিন্তু একই রাজত্বের অংশ নয়।

আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, এই রাজত্বের সীমানা চারিদিকে প্রায় ৩০-৫০ ফুট উচ্চতার গড় মানে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার। তবে এই গড়ের অনেকাংশই এখন বিলুপ্ত কারণ সাধারণ অধিবাসিরা মাটি কেটে নিয়ে যায় এখান থেকে। রাজার রাজত্বের রক্ষা করার জন্য এবং নদীর বন্যার থেকে রক্ষা করার জন্য সম্ভবতঃ এগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

এই গোসানিমারিতেই রয়েছে সুপ্রাচীন এবং সুপ্রসিদ্ধ "ঈশ্বরী কামতেশ্বরী ঠাকুরানী মন্দির"। যদিও রাজপাট এখন ধ্বংস-স্তূপ, মাটিতে ঢেকে গিয়েছে, কিন্তু এই মন্দিরটি এখনো সম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে রয়েছে। মন্দিরের ফলক থেকে জানা যায় কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা এই মন্দির প্রাঙ্গণের সিংহদুয়ারও দেখবার মতো। সিংহদুয়ারের ঠিক ওপরে রয়েছে নহবৎখানা। এই প্রাচীরের চারকোণে রয়েছে চারটি মিনার সদৃশ গম্বুজ। মন্দির প্রাঙ্গনের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত রয়েছে মূল-মন্দির এবং হোমঘর। মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত দেবী কামতেশ্বরীর সিংহাসন। এছাড়াও প্রাচীরের ভেতরে ও অঙ্গনের উত্তর-পূর্বে, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে দুটি ছোট মন্দির রয়েছে। কামতেশ্বরী দেবীর মূল মন্দির ও হোমঘর বাংলা চারচালারীতির চারকোনা ঘরের বাঁকানোকার্নিশের উপরে গোলার্ধাকার গম্বুজ স্থাপন করে তৈরী। সুদৃশ্য গঠনশৈলীর দিক থেকে মন্দিরটিকে 'আলগোছ টুঙ্গি' শ্রেণির মন্দির বলা হয়। মন্দিরটি উচ্চতায় ১৪ মিটার।

এছাড়াও গোসানিমারি ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। মাঝেমধ্যেই কোথাও পুকুর কাটতে কিংবা বাড়ি তৈরি করতে গেলে প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান আজও পাওয়া যায়।

আমরা আজও সুযোগ পেলেই গোসানিমারি ঘুরে আসি, বিষেশতঃ বাইরে থেকে কেউ এলে এখানে নিয়ে যাওয়া টা আমাদের দায়িত্বর মতো করে পালন করি।

আজকাল বাইরে থেকে অনেকেই কুচবিহারের রাজবাড়ি দেখতে গেলে আরো তিরিশ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে গোসানিমারি ও ঘুরে আসেন ইতিহাসের অন্বেষণে।

আমার লেখার অনেক তথ্যই আমার কাছের মানুষ, দিনহাটার ভাই শঙ্খনাদ আচার্যের থেকে জেনে নেওয়া যে দিনহাটার একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের শিক্ষক এবং ইতিহাস গবেষক। লেখার মধ্যে হয়তো বা অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে, তার জন্য আগে থেকেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

বন্ধুকে লেখা চিঠি

সজল কাজী

প্রিয় বন্ধু,

কেন জানি না আজ সকাল থেকে তোর কথা বেশ মনে পড়ছে। কতদিন তোর সাথে যোগাযোগ নেই, কতদিন তোর সাথে কোনো কথা বলা হয়ে উঠে না, কোনো চিঠি লেখা হয় না। আমরা কেমন যেন দিনের পর দিন কৃত্রিম আর যান্ত্রিক হয়ে পড়েছি, প্রয়োজনের চার দেয়ালের বাইরে নিজেদেরকে উজাড় করে দিতে যেন কোথাও ইতস্তত বোধ হয়। বর্তমানের বাস্তবতায় এটাই চরম সত্যি যে আজকের দিনে চিঠি লেখা আসলে এক হারিয়ে যাওয়া শিল্প। অথচ একসময়ে দূরে থাকা আপনজনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি। শুধু কি দূরের ,অন্তরের খুব কাছের কাউকে মুখে না বলতে পারা কথাগুলো সযত্নে সাজিয়ে নেওয়া হতো এই চিঠিতে। এক একটা চিঠির ভিতর কত যে গল্প, নিত্য নতুন ঘটনা, উদ্দীপনা, কত যে ইতিহাস লুকিয়ে থাকতো, আর তার সাথে মিলিয়ে থাকতো আমাদের আবেগ, মনের কোনে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম অনুভূতি।

এক সময় প্রিয় মানুষের লেখা চিঠি মানুষ একবার পড়তো না, বারবার পড়তো, চিঠির ভিতর খুঁজে পেতো যেন সেই মানুষের ছায়া আর আলতো ছোঁয়া। সময়ের বিবর্তনে আজ সে সব চিঠি অমূল্য সম্পদ বিলুপ্ত। বাড়িতে বাড়িতে ডাকহরকরা বা পোস্টম্যান পৌঁছে দিয়ে আসতেন খামে ভরা চিঠি, পত্র মিতালি হতো দেশ বিদেশের বন্ধুদের সাথে, চিঠি নিয়ে আসত চাকরির খবর, পদোন্নতির সংবাদ,নতুন প্রাণের বার্তা। সে যেন এক বাধভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার। প্রবাসী সন্তানের চিঠির পথ চেয়ে বসে থাকতো বাবা-মা, কখনো বা লাল-নীল খামে ভরা চিঠির ভাঁজে সুগন্ধি মাখিয়ে বা গোলাপের পাপড়ি গুঁজে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে যেতো প্রিয় মানুষটির কাছে। হয়তো সেই চিঠি আজ আর নেই। তবু রয়ে গেছে তার স্মৃতি, আবেগমিশ্রিত কথাগুলো।

চিঠির আদলে লেখা, রবি ঠাকুরের গল্প স্ত্রীর পত্র কিংবা কাজী নজরুল ইসলামের বাঁধনহারার মত পত্রোপন্যাস, সুকান্তের প্রতিবাদী চেতনাভরা চিঠিরসঙ্কলন এ সবই আমাদের মনে এক প্রবল অনুরণন তোলে।

আমরা যারা চিঠি লিখে বড় হওয়া প্রজন্ম, ডাকপিয়নের জন্য অপেক্ষায় থাকা প্রজন্ম, আজকের দিনে বন্ধু মানে পড়ছে একটা লাইন - "Letter writing is a lost art"।

আমাদের সময়কার আবেগ আজকের এই নবপ্রজন্মের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এনভেলপ, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড কি তারা জানেই না। দেখেই নি হয়তো। আজকের এই অস্থির সময়ে আমরা চিঠি লিখতে ভুলে গেছি, চিঠি শুধু এখন ইতিহাসের পাতায়, গল্পে, আর উপন্যাসে। বর্তমান যুগের ই -মেইল বড় কেজো, দরকারি কথার বাইরে আর কিছু লেখা থাকেনা, তার উপর রয়েছে কিছু ক্ষুদে বার্তা বা text message।

প্রযুক্তি সভ্যাতার ধারক ও বাহক এ কথা আমরা সবাই জানি, আর মানিও। তবুও চিঠির মতো এতো বিশেষ আর অসামান্য একটি ধারণা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তা যেন নবপ্রজন্মের কাছে কোথায় হারিয়ে গেছে এ কথা ভাবলেই আজ হৃদয়ের কোথাও যেন বেশি না হলেও একটু রক্তক্ষরণ হয় বৈ কি।

তাই তো বলি বন্ধু, আজকের দিনে সুন্দর কাগজে, একটি চমৎকার কলমে শুধু একজনকেই না হয় চিঠি লেখা যাক মনপ্রাণ খুলে, যে চিঠিতে একটি আন্তরিক সম্বোধন থাকবে, না বলা কথা থাকবে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কথা বলা থাকবে, আর সবশেষে নিজের নাম লেখার আগে থাকবে - "ইতি তোমার" বা "আপনার স্নেহধন্য"।

আজ চলি বন্ধু। এভাবেই হয়তো কোনো আরেকদিন নিজের মনের কথা বলা যাবে, অপেক্ষায় রইলাম সেই দিনের জন্য।

স্বর্ণালী সন্ধ্যায়... কিছু মুহূর্ত

উর্মিলা অধিকারী এবং অন্যান্য

শান (২০১৪)

নীল, বিশ্বনাথ, তনিমা ও রূপাঞ্জনা (২০১০)

রাঘব চট্টোপাধ্যায় (২০১৪)

মোনালি ঠাকুর (২০১৩)

ভূমি (২০০৭)

রূপঙ্কর বাগচী (২০১১)

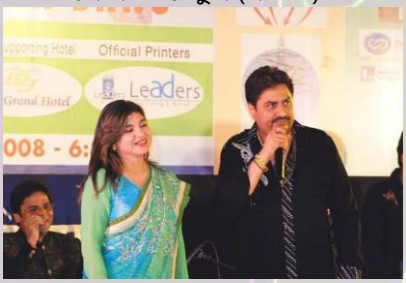

কুমার শানু ও অলকা ইয়াগনিক (২০০৮)

চন্দ্রবিন্দু (২০০৯)

শ্রীকান্ত আচার্য (২০০৭)

লোপামুদ্রা মিত্র (২০০৭)

শ্রেয়া ঘোষাল (২০০৮)

সুমিত্রা সেন (২০১২)

মে দিবস এবং একটি গোলাপ

দেবযানী বিশ্বাস

গল্পটা উৎসর্গ করেছিলাম ওঁকেই,
দাওয়ায় একপেট খিদে ভরা ছেলের চোখে ঘুমপাড়ানি গান ঠুসে
ঠুসে ভরছিলো ওঁর বউ।
গল্পটা হাতে দিতেই রেখে দিলেন ধূসর খাতার ভাঁজে,
যেন কবেকার শুকনো গোলাপ!

বদলে আমাকে দিলেন কিছু হলদে কাগজ,
সিলিকোসিসের আগে ওঁর হাতে লেখা-
প্রথম পাতায় শুধু পাথর ভাঙার শব্দ,
পরের পাতাতেও তাই!
উল্টে গেলাম একের পর এক,
কোন আবেগ নেই,
উৎকণ্ঠা নেই,
হাড় হিম করা অনুভূতি নেই,
পিছন ফেরা নেই,
অপেক্ষা নেই,
নতুন মোড় নেই,
কোন গল্পই নেই.....
আছে শুধু অনন্ত খোঁজ
আর খোঁজার স্বার্থে ভাঙা,

ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া!

ডোলেমাইট, কোয়ার্জ, লাইমস্টোন-
বিভৎস সব শব্দ!
সেই একঘেয়ে শব্দ
ক্রমশ তাড়া করছে আমার পিছনে

এবার কান চাপা দিয়ে দৌড়াচ্ছি আমি
যেন প্রাণভয়ে ছুটছি পাহাড়ি জঙ্গলে
হাতে-পায়ে জট পাকিয়ে বড় বড় মাকড়সার জাল
আর পিছনে দু'টো বাইসন,
খুড়ে তাদের পাথর ভাঙার শব্দ!

হঠাৎ দূর কোন জলপ্রপাত থেকে ডাক দিলো মা,
ভেসে এলো প্রিয়ার চোখের কাজল, ছেলের টিফিনবাক্স -

প্রাণপণে জাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে খুঁজে পেলাম কাকডাকা ভোর
জগদ্দল পাথর সরিয়ে নিলাম বুকভরা প্রশ্বাস,

দেখলাম বিবর্ণ পাতার ভিতর ফুটে উঠেছে গোলাপ!

মিলন

প্রদীপ ঘোষ

দুয়ার তখন বন্ধ ছিল বাইরে ছিলাম একা,
অন্তরে আজ নবীন আশা হয়ত পাবো দেখা ।
বাইরে এখন ঘোর তমসা আঁধার ঘন রাত,
ঝড়ের রাতের উতাল হাওয়ার দুয়ার পরে ঘাত ।
হাতের দীপ নিভু নিভু দাঁড়িয়ে থাকা দায়,
দুয়ার তবুও রুদ্ধ ছিল সময় বয়ে যায়;
অন্ধকারে হতাশ চিত্তে আমার সভয় ডাক,
মনের কোণে প্রবল দ্বিধা আজকে তবে থাক ।
ঘূর্ণি হাওয়ার ক্ষুব্ধ ঝাপট গভীর রাতের কালো,
আগল যদি খোলো এবার পেতেও পারি আলো ।
ভীত আমি ত্রস্ত আমি বইতে নারি আর,
দিশাহারা নিশীথ রাতে আমার গোপন অভিসার;
আঘাত পরে আঘাত হানি দুয়ার খোলো এবার ।
ক্ষণিক দাঁড়িয়ে হতাশ মন সময় হয়নি তার,
ব্যর্থ জীবন স্তব্ধ হৃদয় ফিরে চলেছি একা,
ঝড়ের রাতের একলা পথিক আর হবে না দেখা ।
হঠাৎ তখন থমকে দেখি তুমি অকস্মাৎ ,
দীপের আভায় আলোকিত বাড়িয়ে তোমার হাত ।

চিত্র-শিল্পী: সুস্মিতা দাশগুপ্ত

THE COVID CHRONICLE

Satarupa Nandy

চিত্র-শিল্পী: সঞ্জীনা ব্যানার্জী

My phone just croaked…rolled its eyes….and wheezed at me!!
"There's a whole new sphere – beyond the wonted wee:"
------- Sizzle up a treat; a new recipe
------- Season up the regular; break the modus operandi;
------- Soak up a skill; state-of –the-art your artistry;
------- Spick-and-span the co-op; your splendid snug nest;
------- Spice up the kinships and the spousal; bond your best.
As the unusual emerges the current usual…
Seize time – to count your blessings and embrace the ritual.

My lad just gasped…coiled his arms around…and whispered to me!!
"Mamma…I crave my friends – with them I want to be:"
------- Call up folks; chat on networked tool;
------- Conference online; heedless who – is the rule;
------- Cyber learning oust the breathing busy buildings;
------- Classes distant; Computers is the isolate school
------- Distancing closed ones; is now the compelling new cool
As the virtual currently suspends the reality…
Reminisce the times – count your blessings and pray for a resolve to this barbaric rarity.

My other half sighed…hung his head…and wailed with me!!
"We're at the edge…the selves are suffering…Creator's dire decree"
------- Positive cases recounted; escalating each passing day
------- Proceeding out of doors is combat; crisis every step of the way
------- Prepping amidst masks & mittens, running errands in dismay
------- A petty sneeze; a paltry cough; perhaps will, all senses outweigh
------- Whilst the populace salvages; several surrender to the decay
As I sit back privileged, mundane uplifts itself to out-of-ordinary capacity…
I yield my time and kiss my man – count my blessing midst the catastrophe.

My calendar just moaned…clutched its teeth…and whined before me!!!
"Time has ceased to fly…dates don't go by – the world is a quarantine"
------- I see the worth of time; the one I most misuse
------- I fear the wrath of nature; the mother I wittingly abuse
------- I prize my people, my pals; the bonds that I idly leave loose
------- I value my freedom; the entertainments – the amuse
------- I honour my health above all – for life is the true muse
As I unlock the regenerated self in my Covid lockdown chronicle….
I spend time at home – count my blessings and hope for a merciful miracle.

SMALLER GARDENS (AN ACROSTIC SONNET)

Avik Datta Gupta

Satisfied souls live in smaller garden of thoughts!
Meandering souls search for illusive satisfaction,
Altering egos, calculates haves and have-nots!
Limping on the shores of abstract attractions.
Listings live while the contents perish,
Endangered souls wake up in awe!
Remembering life once was worth a cherish!
Garnered and gutted by garrulous words of law.
And times walked as usual, all the way!
Ravishing gardens were broken yet blooming!
Dancing lonely, a flower did sway,
Existing in smaller gardens, unassuming!
Nesting in hopes these lines do weep!
Sings a lullaby before falling asleep.

চিত্র-শিল্পী: প্রত্যুষা ঘোষ

আলোর খোঁজে

দেবযানী বিশ্বাস

আমি তো দেখেছি আমার উঠোনে শুধু
হেঁটে হেঁটে আসে পৃথিবীর যত কালো।
তুমি বলেছিলে ভয়াল সে কালো রাত
তোমার ঘরেতে সিঁদ কেটে গেছে কালও!

তারপর শুধু গুছিয়ে গেলাম দিন-
ছিনিয়ে নিলাম পায়রা সুখে'র পালক,
দিনান্তে তুমি পেরিয়ে যা কিছু জীর্ণ
কুড়িয়ে নিয়েছো অপরাহ্নের আলো।

যতবার তবু পিঠ ঠেকে গেছে আর
ধোঁয়া ধোঁয়া দেখি চরাচর মহাবিশ্ব,
মুখ ঢেকে দিয়ে প্রতিবিম্বের শুধু
চেঁচিয়ে বলেছি "ঈশ্বর হা ঈশ্বর"!

আমি তো কেবল ঈশ্বর খুঁজে যাই
এ জন্ম আর প্রতি জন্মান্তরে-
হয়তো তিনিও বোধিবৃক্ষের নীচে
মানুষ খোঁজেন ক্ষয়িষ্ণু প্রান্তরে!

চিত্র-শিল্পী: সংকল্প রায়মন্ডল

A CLUTTER OF UGLY PAGES

Avik Datta Gupta

We have written a lot!
Whatever had filtered and percolated,
Through the ugly granules of filth,
Within our minds, that always decided time after time,
To taste a new light for a while,
After long hiatuses in the dark.
We have a million thoughts within,
Our bustling, boisterous, chattering minds,
Some of them appeal to our inane senses,
And we choose to write, before it evaporates.
And as the waves of time sweeps, below our feet,
We forget those moments that made us think,
All the joys and love we had pushed out,
From ourselves.
And then one day, we clean up our cluttered tables,
To chance upon some ugly papers once more,
That speaks of our beautiful thoughts from the past,
Our forgotten thoughts of beauty,
Our lost feelings of love,
Our marooned feelings of hope,
Our faces without an ugly mask!
Keep adding to the clutter and reassure,
That there is still a part of us, that hasn't died,
It still lives on those dead and ugly pages,
In a tattered note book,
Which may also live after you die.
And someone later on, may shed a tear,
Live and feel your fair thoughts,
That's vanish now in you
With the blink of an eye!

অবিশ্বাস্য

শ্রীরূপা মিত্র

ভাগাভাগির রোজ নামচা
জানলা রোজই দেখে
সহজ কথা কঠিন বড়
অবিশ্বাসের শখে।

ভাঙছে দেশ, ভাঙছে ঘর
বুদ্ধিশুদ্ধি তাবড় তাবড়,
ভাঙছে মন, ভাঙছে মান,
চলছে হিসাব লাভ-লোকসান!

অন্ধমনের আতিশয্য
গোলকধাঁধায় সব বিচার্য।
সোজাটারে উল্টো করে
উল্টোটারে সোজা ধরে।

স্বার্থপরের দাপট বড়।
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো!
ফকির হাসে দিনের শেষে
মানুষ মরে কিসের আশে!!

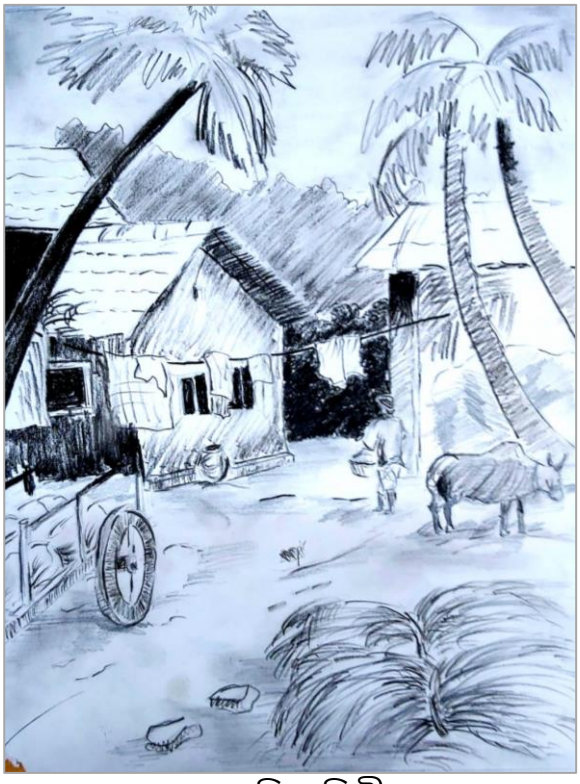

চিত্র-শিল্পী: অঙ্কুশ ঘোষ

মূল্যবোধ

আত্রেয়ী চক্রবর্তী

সাপুড়েতে সাপ ধরে পেট চলে তায়,
জেলে ভালো মাছ ধরে অন্য লোকে খায়।
রোমিও -রা মেয়ে ধরে রিপু তাড়নায়,
কিন্তু শেষে ভুগে মরে বিরহ জ্বালায়।
সকলেই স্বপ্ন দেখে মনের কিনারায় -
কিন্তু সেই স্বপ্নগুলো উড়ে চলে যায়।
স্বপ্নগুলো বন্দী করে বুকের পিঞ্জরেতে,
সাধারণ থেকে যায় অসাধারণেতে।
কল্পনা (চাওলা), ঈশ্বর (বিদ্যাসাগর) কিংবা লিঙ্কন,
স্বপ্নকে ধরে রেখে আজ গুণীজন।
কেরানিরা বুদ্ধিজীবী ছুতো-ফাঁক বোঝে,
নিজের ভালোটা ছাড়া সবকিছু খোঁজে।
তাই বলি শোনো সবে স্বপ্নটাকে ধরো ,
ফলের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু কর্ম করো।
তারপরেতে বৎসরান্তে মূল্যায়নের পালা ,
দেখবে তুমি কাক নেই আর (তোমার) ময়ূর পেখম মেলা।

দুটি ডানা

রাশিদা সুলতানা

পেতাম যদি দুটি ডানা
থাকত না তো উড়তে মানা।
ক্লান্ত হলে গাছের ডাল
কিংবা কারো ঘরের চাল ,
জিরিয়ে নিতাম খানিকক্ষণ
দেখতো আমায় মানুষজন।

খিদে পেলে নদীর জল ,
কিংবা খেতাম বনের ফল।
কাটিয়ে দিতাম হাসিমুখে,
জীবনের সব দুঃখ সুখে।
যেতাম উড়ে নীল আকাশে
ঘুরে বেড়াতাম যেখানে সেখানে আকাশে বাতাসে।

ফিরে আসতাম পৃথিবীর বুকে
নিয়ে একরাশ মনের সুখে।
পেতাম অনেক বন্ধুজন
যেখানে নেইকো পর সবাই আপন।
পেতাম যদি দুটি ডানা
থাকত না তো উড়তে মানা।

অর্ধ্যসত্য জীবন

প্রদীপ ঘোষ

দিনের শেষে বেড়ায় ঘুরে একা অর্ধ্যসত্য জীবন !
আলো আঁধার মোহজালে যতই বেড়াস ঘুরে -
বাউল তোর ঘুরে বেড়ানোই সার , মেলে না তাল সুরে।
রঙ্গীন নেশা, আদিম আশা সবখানেতেই ফাঁকা,
কোথাও যেন মেলে না রং, তোর নিত্য ছবি আঁকা।
নিজের ক্ষেতেই করিস নে তোর অলীক স্বপ্ন সৃজন !
প্রভাত আলোয় বেড়ায় ঘুরে এ এক অর্ধ্যসত্য জীবন।

ভবঘুরে, বুঝবি নে তুই রচিস কিসের জাল?
কিসের আশায় অলীক ভাষায় চালিস কত চাল !
তোর গানের ভাষায় মেলেনা ঠিক তালের পরে তাল –
যতই আঁকিস, যতই ঝুঁকিস মিলবে না কোনো কাল।
ভরবে না তোর আপন ঘর,নিজেই যে তুই কৃপণ !
দগ্ধ ক্লান্ত,তবু বেড়ায় ঘুরে এ এক অর্ধ্যসত্য জীবন !

রিক্ত ভাষায়, ছিন্ন আশায় লিখিস এত কিছু,
দাগ লাগে না কোনও মনে, ফেরে না সে পিছু।
যতই লিখিস ততোই ভাবিস,কোথাও কি নেই আশ ?
মিলের ঘরে অমিল খোঁজা,জানিস নে কি চাস।
ক্ষেপা,তুই সদাই একা,কেই বা তোর আপন;
সন্ধ্যাবেলা একলা পথে বেসুরে গায় অর্ধ্যসত্য জীবন !

গহন জলে ঝাঁপ দিলেও,তোর ডোবাই হবে সারা,
ডুবেই তো তুই ভাসতে চাস,এতোই কিসের তারা;
আর কিছুকাল ধৈর্য ধরে কাটা না হয় কাল -
যাযাবরের নেশা কেটে ফেরায় যদি হাল !
নতুন করে গড়বে ভাবিস সাতরঙা এক জীবন,
রাতের আঁধার জানিয়ে যায়,এ এক অর্ধ্যসত্য জীবন !

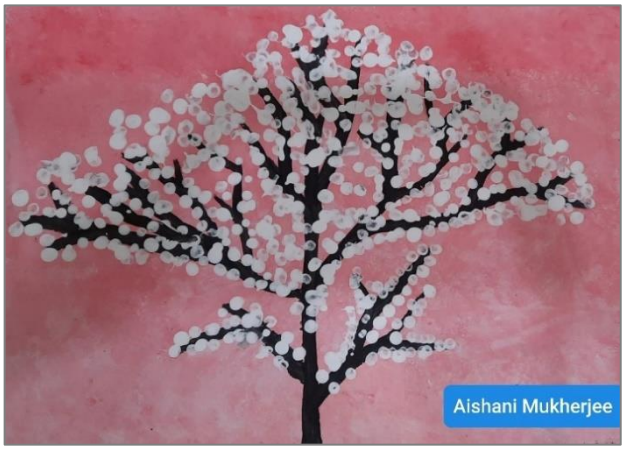

চিত্র-শিল্পী: ঐশানী মুখার্জী

প্রচেত তোমায়

পর্ণিনী চ্যাটার্জী

আজ তোমার অসীম চোখে মেখে,
অনন্ত এক সমুদ্র হতে চাই,
সূর্যের উদাত্ত আলোয় আকাশের অবগাহন,
ভোরের প্রথম আলোর চুম্বনের মত স্নিগ্ধ,
নিরন্তর নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়ে,
ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাউ বনকে ছুঁয়ে যেতে চাই;

জ্যোৎস্নার মোম আলোয় রাত ভোর শুয়ে,
নির্নিমেষে শুন্যলোক পানে অবলোকন,
সহস্র কোটি নক্ষত্র উজ্জাপনের রাত,
সৌরভের মত ছড়িয়ে সিক্ত অভ্রের দ্যুতি;
গহীন নিশার আঁধারে ফসফরাসের গান,
দীপ্তি তে প্রজ্বলিত আমার অন্তর জাগরণ!

সমুদ্র, আমি তোমার মত গভীর হতে চাই!
অতল মনের মাটি তে রোপণ করা মুক্তার
সন্ধান পাবে না কেউ জীবন ভর;
দুরন্ত উচ্ছল সাজে ঢেউ হয়ে যে বাঁচবে,
জানবে আমায় যত গভীরে যে যাবে,
তোমার মত শুধুই ফিরিয়ে দিতে চাই, সমুদ্র!

সম্মুখে সাক্ষী যখন তোমার অনন্ত রূপ!
সমুদ্র, আমি শুধু তোমার মতই হতে চাই;
আকাশের সাথে মিশে থাকা তুমি,
এই দীন আমি, তোমায় বড়োই ঈর্ষা হয়!
এই বিশালতার জানি যোগ্য নই আমি,
তবু আমি আর এক জীবনে সমুদ্র হতে চাই!

Tumি চাইলে

রাজীব মন্ডল

তুমি চাইলে করতে পারি সব,
সইতে পারি সব তুমি চাইলে।
তুমি চাইলে নিদ্রা চোখেও চাইতে পারি
দেখতেও পারি তুমি গান গাইলে ॥

নীল রঙ যদি ভালো না বাসো তুমি,
নীল আকাশ টা কেউ পালটে দেবো আমি ॥

লাল রঙ যদি লাগে ভালো,
নীল কেটে আকাশটাকে করে দেবো লাল।
জল যদি লাগে ভালো -
করতে পারি রাস্তা কেটে খাল।
তুমি চাইলে মাথায় করে
আনতে পারি তুলে,
উত্তরের ওই হিমালয় ॥

তুমি চাইলে বুক ফুলিয়ে ঘুরতে পারি,
করবো না কাউকে ভয়।
স্বর্গ থেকে আনতে পারি অমৃত,
তুমি যদি খাও।
আরো অনেক কিছুই করতে পারি,
শুধু তুমি যদি চাও ॥

চিত্র-শিল্পী: উপমন্যু বোস

চিত্র-শিল্পী: অদিতি বাচস্পতি

ইয়ে

তুষার কান্তি মন্ডল

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের রোজনামচায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দগুলির একটি হল - 'ইয়ে'। অথচ এই 'ইয়ে' শব্দের 'ব্যুৎপত্তিগত অর্থ' খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। বাংলা অভিধান বলছে - আমরা বাঞ্ছিত ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পেয়ে সেই ফাঁক পূরণের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করি - তাই হল 'ইয়ে'। 'ইয়ে' কিন্তু একটি সার্বজনীন অমাত্রিক শব্দ। আমার তো মনেহয় বাংলার সবচেয়ে আদিমতম শব্দ হল এই 'ইয়ে'; তা না হলে 'ইয়ে' দিয়ে যথাযথ 'ইশারা' প্রকাশ করার মত আর অন্য কোনো যুতসই শব্দ, কার্যকরী অলঙ্কার ও রসময় অনুপ্রাস বাংলা শব্দ ভান্ডারে আছে কিনা সন্দেহ!

এই ধরুন আপনি, অফিস বেরোনোর আগে 'ইয়ে' খুঁজে পাচ্ছেন না ! হাঁক পাড়লেন — "শুনছো! আমার ইয়েটা কই?" দেখবেন — গিন্নি ঠিক পার্স নিয়ে হাজির ! দু মিনিট পরে আবার হুকুম "ইয়েটা কই গো?"— স্যাট করে দেখবেন আপনার চোখের সামনে গাড়ির চাবি ঝুলছে। সঙ্গে দু'খান ইয়ে... "আজকাল কিছুই তো মনে রাখতে পারো না ! ইয়েটা তো ঠিক মনে থাকে!"

পার্কিং-এ জাস্ট গাড়িতে বসেই ফোন — "এই....ইয়েটা দিলে না তো !" বিদ্যুৎগতিতে আপনার ভুলে যাওয়া 'ইয়ে' এসে হাজির! আসলে যে বোঝার সে ঠিকই ইয়ের মানেটা বোঝে। পাড়ার রকে লেকচার হোক কি মাচায় বক্তৃতা — প্রেমের প্রস্তাবই হোক বা বি-ইয়ে-র ! আসল সময়ে বাঞ্ছিত শব্দটি মনে পড়ে না? দোনামনা? কুন্ঠা? ভয়? গোছা গোছা ব্রাহ্মী শাক খাচ্ছেন, কাজ হচ্ছে না — বোতল বোতল ব্রেনোলিয়া নিয়ম মাফিক খাচ্ছেন, তাতেও কাজ হচ্ছে না? সব সমস্যার মুস্কিল আসান এই 'ইয়ে'!

মনের যেকোন জড়তাকে 'ইয়ে' দিয়ে রাংতার মত যত্নে মুড়ে দিন — ব্যাস, কেল্লা ফতে।

চলে যান নিজের পাড়ায় - "দাদা নেক্সট ইয়ারের ইয়ে টা এবার যাবার আগে একটু দিয়ে গেলে ভালো হোত"। ওদেরই মধ্যেএকটি গেছো সর্দার আবার আপনাকে একটু পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে — "ডিউটি ফ্রি থেকে আমাদের ইয়েটা এনেছো তো?"

কব্বে সেই দশ মাস পরে পুজো — আপনি ঠিক পকেট থেকে কড়কড়ে কয়েকটা 'ইয়ে' বার করে দিয়ে বিদায় দিলেন — সঙ্গে বিড়বিড় করে দুচারখানা 'ইয়ে' — অভিশাপ আর কি!

পাড়ার সদ্য বিবাহিত যুবকের কাছে দাদুর নিষ্পাপ প্রশ্ন – বাবা নতুন নাতবৌয়ের 'ইয়ে' কেমন বুঝছো ? নিত্য দিন দাদুর পিছনে লাগা ছোকরা — ভিসুভিয়াসের মত রাগ উগড়ে দিয়ে দাদুর 'ইয়ে' দিল ফাটিয়ে ! দাদুর ফাটা মাথা ঠিক হতে লাগল সাত সাতটি দিন ! দাদু হয়তো বলতে চেয়েছিলেন এক, 'ইয়ে' ছোকরা বুঝল এক! 'ডিকোডিং' এর গন্ডগোলে 'ইয়ে'র এ এক আশ্চর্য বিড়ম্বনা ! আসলে এই 'ইয়ে' শব্দটির দ্যোতনা কখনও যেন বিন্দুর মত ছোট আবার কখনও দিগন্ত সমান ব্যাপ্ত ! যা বলা উচিৎ নয় অথচ বলা দরকার, বলতে চাইছেন কিন্তু বলতে পারছেন না অথবা আদৌ বলতে চাইছেন না... সব কথার এক কথা বোঝাবে ওই একটাই শব্দ। ইয়ে।

ইয়েচুরি থেকে ইয়ে-দুরাপ্পা যার খুশি বক্তৃতা শুনুন- ওরাও সেই, কথার ফাঁকে ফাঁকে "ইউ নো....ইউ নো..." করে 'ইয়ে' গুঁজে দেয়। আর এই "you know...." ফ্রেজের পাতি বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'ইয়ে'।

আমার আবার কখনও মনে হয় 'ইয়ে' মোটেও বাংলা নয়- একটি খাঁটি হিন্দি শব্দ যেটা বাংলায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

বাংলা ভাষার স্বঘোষিত নয়া ঠিকাদার 'ইয়েপক্ষ' আমার এই প্রবন্ধ পড়লে হয়তো রে-রে করে তেড়ে এসে বলবে — 'ইয়ে' হাত মুঝে দে দো ঠাকুর!

ওরা বুঝবে না — সত্তর এর দশকে যারা স্লোগান দিয়েছিল "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়" কিংবা "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"; এই মন্ত্র নিয়ে যারা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মাইলের পর মাইল মিছিলে পা মিলিয়েছিল— তারা সবাই আজ "ইয়ে কালি কালি আঁখে, ইয়ে গোরি গোরি গাল..." ডি জে বাজিয়ে যারা মিছিল করে ঠাকুর 'বিষম-জল' করতে যায়!

তারা সবাই একই 'ইয়ে' নয়। 'ইয়ে' দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে, চলতে চলতে মেরে 'ইয়ে' গীত.. ইয়াদ রাখনা....কালজয়ী জনপ্রিয় হিন্দি গানের সঅ..অব এই 'ইয়ে'- আসলে এক অনন্ত অব্যয়।

জানলে অবাক হবেন— ষাটের দশকে রিয়াল মাদ্রিদ দলটির ডাকনাম ছিল "ইয়ে-ইয়ে"! নামটা বিটলসের "সি লাভস ইউ" গানের "ইয়াহ, ইয়াহ, ইয়াহ" কোরাস থেকে

নাকি নেওয়া। রিয়ালের চার ফুটবলার বিটলসের সদস্যদের মতো চুলের স্টাইল নিয়ে ছবি তোলাতেই নাকি এই নাম! আগেই বলেছি — 'ইয়ে' শব্দের মাহাত্ম্য অপরিসীম।

বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী এমনকি আরো অনেক অজানা ভাষায় 'ইয়ে' শব্দটি বহাল তবিয়তে বিদ্যমান।

এতদিন যারা মঞ্চে, কাব্যে, সাহিত্য-আলোচনায় 'ইয়ে' শব্দটিকে তেমন কদর করিনি; শুধুই প্রয়োজনমত ব্যবহার করেছি, এ মুহূর্তে তাদের মনে হতেই পারে — তাহলে 'ইয়ে' কি সত্যিই একটি আন্তর্জাতিক শব্দ?

সিঙ্গাপুরের প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা "সিও তিয়ান চাই" তাঁর "ইয়ে ফং" ডাকনামেই অধিক পরিচিত। বিতর্কিত চীনা চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক "লু ইয়ে" অনেক আবেগী ও কার্যকরী ছবি বানান। আবার 'পিপলস ব্যাঙ্ক অফ চীন' এর বর্তমান গভর্নরের নাম "ইয়ে গ্যাং" ! আরও শুনলে অবাক হবেন- সম্প্রতি নিজের আসল নাম বদলে ফেলেছেন মার্কিন র‍্যাপার ও সঙ্গীত প্রযোজক কানিয়ে ওয়েস্ট। তিনি এখন পরিচিত 'ইয়ে' নামে। উনি আবার মার্কিন সুপার মডেল কিম কার্দাশিয়ানের 'ইয়ে'!

সুতরাং আন্তর্জাতিক আঁকিয়ে, কইয়ে, খা-ইয়ে, গা-ইয়ে... সবাই ... ইয়েমেন থেকে ইয়েরেভানের সবাই ঐ 'ইয়ে'র প্রতি ফিদা!

আমরা যারা "ইয়ে....মানে বলছিলাম কি" দিয়ে কথা শুরু করি— যাদের স্পষ্ট কথা বলতে একটু 'ইয়ে' হয়, তাদের জীবনে এই 'ইয়ে'র অবদান - মাধ্যমিকে ফার্স্ট করা ছায়া প্রকাশনীর সহায়িকা কিংবা রায় অ্যান্ড মার্টিনের কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কের চেয়েও অনেক বেশি!

সান্ধ্য পার্টির একান্ত আড্ডায় জল ভরা সন্দেশের মত রসভরা গসিপ পেটে নিয়ে সবে মুখটি খুলেছেন, অমনি বৌদির চোখ টেপা ইশারায় আপনার দ্বিতীয় বাক্যের তৃতীয় শব্দ হয়ে গেল 'ইয়ে' — "ওর কথা আর বলিস না... খুব 'ইয়ে'..." এইটুকু শোনার পর আমাদের মাথায় 'ইয়ে'র পেজ, পোজ, ক্যারেক্টার আর সিনট্যাক্স সার্চিং চলে গুগল সার্চের মত। সব 'ইয়ে' যারা সহজেই Decode করতে পারে সেই জিনিয়াসদের ইয়েকে কুর্ণিশ করতেই হয়!

চিত্র-শিল্পী: প্রত্যুষা ঘোষ

বড় দাদু

সুপর্ণা ঘোষ

বাড়িতে বড় দাদু এসেছেন। তাই তীর্থা, সাহিল, দীপের ভীষণ আনন্দ। বড় দাদু আসা মানেই নানা রকম গল্প। উনি তীর্থা র মায়ের কাকা হন। তীর্থা দের দাদু।

মায়ের মুখে তীর্থা শুনেছে যে বড় দাদু কলেজে পড়ান। নানা দেশ-বিদেশে ঘোরেন। এমনকী অনেক বইও লিখেছেন।

দীপ ক্লাস ওয়ানে পড়ে। তীর্থার কাকার ছেলে। হাতে সব সময় টেডি বিয়ার নিয়ে ঘোরে। তা দেখে বড় দাদু বলেন, এই টেডি বিয়ার নামকরণের রহস্য জানিস কি?

ওরা যথারীতি ঘাড় নেড়েছিল। বড় দাদু বলেছিলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজভেল্ট। উনি শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। এক দিন শীতকালের শেষের দিকে উনি শিকারে বেরিয়েছেন। কিন্তু সারা দিন ঘুরেও তিনি কোনও শিকার পেলেন না। প্রেসিডেন্টের খুব মনখারাপ। তখন তাঁর সঙ্গীরা অনেক খুঁজে খুঁজে সন্ধেবেলায় একটা ছোট্ট ভালুকছানা পান। সেটাই প্রেসিডেন্টের সামনে রেখে শিকার করতে বলেন।

কিন্তু অত ছোট ভালুকবাচ্চা দেখে প্রেসিডেন্টের খুব মায়া হয়। উনি বললেন, না, এটাকে না মেরে বরং সঙ্গে নিয়ে যাই। পুষবো। রুজভেল্টের ডাকনাম ছিল টেডি। তাই সবাই ভালুকছানাটিকে টেডিজ বিয়ার বলত।

চিত্র-শিল্পী: স্নিথিক দত্ত

বড় দাদু গল্প থামিয়ে, জল খেয়ে তীর্থার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই তো ক্লাস এইটে পড়িস। নিশ্চয় জানবি। বলতো, আমেরিকার রাজধানী কী?

তীর্থা বলার আগেই সাহিল লাফিয়ে উঠে বলল, আমি জানি। ওয়াশিংটন।

বড় দাদু বললেন, বাঃ বাঃ, ক্লাস ফোরে আমি কিন্তু তোর মতো জানতাম না রে, সাহিল । সাহিল লাজুক হাসি হেসে বলল, ধ্যাৎ।

বড় দাদু আবার শুরু করলেন ওয়াশিংটনের এক ব্যবসায়ী কাপড় আর তুলো দিয়ে খেলনা ভালুক বানালেন। দেখতে ঠিক প্রেসিডেন্টের ভালুকের মতো। আর সেগুলো বাজারে 'টেডি বিয়ার' বলে বিক্রি করতে লাগলেন। ব্যস, এ ভাবেই টেডি বিয়ার বাজারে চলে এল।

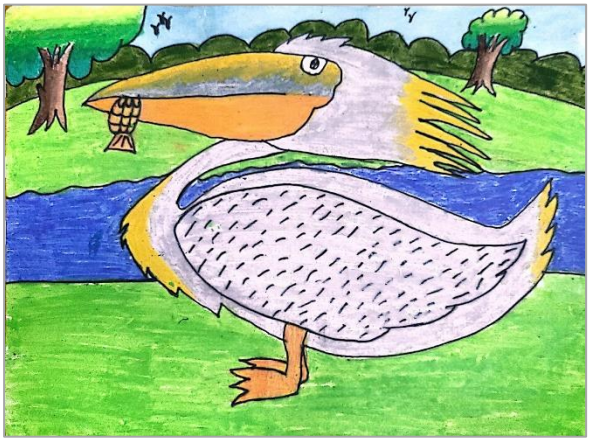

চিত্র-শিল্পী: ঋষিকা দাস

এ রকমই নানান বিষয় নিয়ে দাদু ওদের গল্প বলেন। আবার মাঝে মাঝে ওদের নিয়ে বেড়াতেও যান।

এ বারে ওদের নিয়ে শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেনে এসেছেন। বলেছেন, সবার আগে বিখ্যাত বটগাছটা আমরা দেখব। তার পরে তোদের 'ভিক্টোতীর্থা অ্যামাসাহিল নিকা' দেখাব।

তীর্থা জিজ্ঞাসা করেছিল, সেটা কী গো বড় দাদু? দাদু রহস্যময় হাসি হেসে বলেছেন, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

তীর্থাদের সঙ্গে ওর মামাতো বোন আঁখি আর ওর ভাই অভিও এসেছে। নানা রকম গাছ দেখতে দেখতে ওরা সেই বিখ্যাত বটগাছটার সামনে থামল। গাছটা দেখে সবাই অবাক। এত মোটা মোটা ঝুরি চার ধার থেকে নেমেছে যে গাছের মূল গুঁড়িটাই চেনা যায় না।

মশলামুড়ি খেতে খেতে বড় দাদু বললেন, ওই দ্যাখ একটা বড় পুকুর দেখতে পাচ্ছিস। ওখানেই ভিক্টোরিয়া আম্যাজনিকা ফুটে আছে।

ওরা একসঙ্গে 'কোথায় কোথায়' বলে দেখতে লাগল। আঁখি জিজ্ঞাসা করল, বড় দাদু এই ফুলটা কিন্তু অন্য কোথাও দেখিনি। তীর্থা রাও ঘাড় নাড়ল।

বড় দাদু বললেন, এই ফুলটা প্রথম ফোটে লন্ডনের কিউ গার্ডেনে। সেখান থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যই নাম হয় ভিক্টোরিয়া আম্যাজনিকা ।

বড় দাদু বললেন, নামটা শুনেই বুঝতে পারছিস এর আসল জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের আমাজন নদীতে। ওখান থেকে বীজ এনে ১৮৭৩ সালের কাছাকাছি শিবপুরের এই উদ্যানে লাগানো হয়েছিল। তীর্থা হিসেব করে বলল, ওঃ মাই গড! প্রায় ১৪৮ বছর আগে।

বড় দাদু ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক তাই। পাতাগুলো তাকিয়ে দ্যাখ কেমন চকচকে সবুজ রঙের। তাই জল জমে না। আর পাতার ব্যাস প্রায় দেড় মিটারের কাছাকাছি। কানা উঁচু থালার মতো দেখতে। শুনলে আরও অবাক হবি যে, এই পাতার ওপর যদি তীর্থা তুইও বসে যাস তো ডুববি না।

চিত্র-শিল্পী: আর্থিত ঘোষ

তীর্থা লাজুক হাসি হেসে বলল, যাঃ, কী যে বলো না বড় দাদু, আমি কি রোগা প্যাকাটি দীপ ! দীপ চোখ পাকিয়ে ওর দিদির দিকে তাকাল।

বড় দাদু বললেন, না রে, আমি মজা করছি না। সত্যিই। এক একটা পাতা প্রায় ৪২ কেজির মতো ওজন বইতে পারে। পাতা ডুববে না। প্রমাণ চাস তো চল, তোকে বসিয়ে দিচ্ছি। তীর্থা আঁতকে উঠল, না না থাক!

বড় দাদু বললেন, ফুলগুলো দ্যাখ পদ্মফুলের মতো। ইংরাজিতে 'রয়াল ওয়াটার লিলি' বলে। এক একটা গাছে ৪০ থেকে ৪৫টা পাতা আর ৩০ থেকে ৩৫টা ফুলের কুঁড়ি হয়। কুঁড়ি থেকে ফুল হতে সময় নেয় প্রায় তিন দিন। এই গাছগুলো সাধারণত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকে।

সাহিল বলল, বড় দাদু, তুমি এত সব জানো কী করে?

বড় দাদু মুচকি হেসে বললেন, মনের মধ্যে জানার ইচ্ছে আর উৎসাহ রাখবি। তা হলেই সব জানতে পারবি। এখন সব ওঠ। তাড়াতাড়ি অর্কিড হাউসটা দেখে বাড়ি ফিরতে হবে।

আঁখি বলল, ভাগ্যিস বড় দাদু তুমি আমাদের এখানে নিয়ে এলে। না হলে রয়াল ওয়াটার লিলির কথা আমাদের অজানাই থাকত। সবাই আঁখির কথায় সায় দিল।

দীপ বলল, এর পর কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের? বড় দাদু দীপর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, এবার আর হবে না রে। কালই দিল্লি যেতে হবে। এর পর যখন আসব তখন আবার অন্য জায়গায় নিয়ে যাব, কেমন।

বড় দাদুর কথায় ওরা সবাই চুপ হয়ে গেল। আবার দিন গোনা শুরু হবে। কবে বড় দাদু আসবেন আর ওরা নতুন নতুন কথা জানতে পারবে।

চিত্র-শিল্পী: আর্থিত ঘোষ

CHAMPIONS LEAGUE UPDATES

Adheep Sengupta

Here is a brief update on the ever-exciting champions league football, which will resume once again on **November 23rd**. Matchday 5 will feature football's finest, including Bayern Munich, Manchester United, Juventus, and Benfica.

Unbelievable upsets

- Manchester United lost to Young Boys, 1-2 on the opening champions league day.
- Barcelona once again took a beating 0-3 by the team that demolished them last year: FC Bayern Munich.
- On matchday 2, a Moldovian team by the name of Sheriff had starstruck Real Madrid with a narrow 2-1 win.
- On the same day, the Portuguese team Benfica had left Barcelona the same way Bayern Munich did- in the dust with a 3-0 victory.
- On matchday 3, the yellow wall Borussia Dortmund had been outperformed by the flying Dutch Ajax in a crushing 4-0 victory, which had us reminiscing of their incredible run during their 2018-2019 champions league campaign.
- Matchday 4 was a repeat for Ajax against Borussia Dortmund with a 3-1 win.
- On that day, Redbull Leipzig, a relatively new German team, were able to hold down PSG with a 2-2 draw

Barcelona loss to Benfica

Spectacular Matches

- Our first two spectacular matches occurred on the opening night, with Liverpool and AC Milan battling head-to-head, ending with a tightly contested 3-2 win for Liverpool.
- The second match was Manchester City and Red Bull Leipzig having a goal fest with 9 goals scored altogether. The match ended with Manchester City doubling Redbull Liepzigs score in a 6-3 victory.
- Matchday 2 had us all excited for two amazing teams, Manchester City and Paris- Saint Germain playing against each other. In that match, Paris-Saint Germain was the better side, winning 2-0.
- Matchday 4 had Manchester United against Atalanta United, an Italian team that has been doing fairly well in their past few champions league campaigns. This match ended with one Cristiano Ronaldo bagging a late winner, putting the red devils up 3-2.

Standings

At the moment, only 4 teams have secured their spot in the Round of 16: Ajax, Bayern Munich, Juventus, and Liverpool

Individual Performances

The player with the most goals right now in the champions league is none other than Ballon D'or contender Robert Lewandowski with 8 out of 17 goals. Just behind him in 2nd is an underrated striker providing Ajax with half their goals. He is a Frenchman, Sebastien Haller, with 7 goals scored for his team. In 3rd, we have a dark horse contender with the name of Adama Traore, that is providing the Moldovian team Sheriff with all 6 of their goals.

Robert Lewandowski

For the players providing the goalscorers with their chances, 3 players that are tied for 1st in assists: Bruno Fernandes of Manchester United, Antony Matheus of Ajax, and Leroy Sane of Bayern Munich, each having 4 assists.

-

চিত্র-শিল্পী: কৌশানী মুখার্জী

HOW IS HISTORY USEFUL TO US?

Shreyas Ghosh

To a vast majority of people, History is a despicable subject. It is loathed by many, and most people either hate it for not yielding enough marks, and some like it for yielding a lot of free, easy, and by-hearted marks. But, whatsoever the situation, very few people actually like to study it. The thing is quite simple, History or, Hi (his) & Story, or his story. It is the story of how some came to power, made mistakes, and went out of power, and the people's thoughts alongside. In short, it is journalism or the news, but of a begone era.

So, how does history help us? It tells us about the strengths of the people in the past, and how we can improve upon them as well as, the mistakes they made, and what we can do to improvise upon those mistakes.

And, what is the history of history? History is derived from the Greek word 'Historia,' which means to inquire. The term is said to be first, prominently, used by the Greek philosopher, Aristotle. The term 'history' was drawn into English, from Latin and has been used ever since, it was used for the first time at the beginning of the 12th century.

It can also be classified into different types. Based upon the time period, it is of three types, Ancient, Medieval, and Modern. And based upon the topic, it is of six types, Political, Social, Diplomatic, Military, Economic, and Cultural.

Why should we study history? Many people believe that History is a dead subject, with limited to no job opportunities. But the truth is, less that 15% of what has happened in the past, has been rediscovered by us. There is more to be discovered, more to be learned, and more to known than we already know. There is, and never will be, an end to knowledge. For the people who believe history is an unsavvy subject to choose, here is a fact for them to pick up. We are human beings, Homo sapiens, to be more precise. There are more than 50 other lineages of human beings, some of them being Homo erectus, Homo antecessor, and over the course of time, even more are being discovered, which have not even been named. Some of them include, the Denisovan people and the newly discovered South African people footprints and DNA.

What consequences does forgetting our history bring to us? Well, for one, since we started making history of our own, we have started to have a general tendency to ignore the occurrences of the past, which will make us more vulnerable, moving on, to the mistakes made in the past. For example, the Roman Warm Period, between 250 BC & 400 AD, was a warmer period in Europe, where they experienced warmer temperatures, similar to current ones, and philosophers such as Theophrastus had documented it, and the steps they had taken to combat it. Albeit it was a smaller global warming event, and they didn't have the modern amenities we are so well-versed with, they did take steps, and with proper interpretation and modification, we may be able to solve the global warming crisis.

So, is History good or bad? It will depend upon the reader, and how the person will interpret the message. At times, it has been alleged that historians only focus on the rosy picture, leaving out the truth, which can be said, but there are historians who base their views on the common people. So, finally, it will depend upon you, whether you want to read history or not. But, why not take a chance to peek into some history books (not the school ones), and look at the information, pitching up in front of you?

MOVING WITH THE FLOW OF TIME – A STRATEGY

Priyasha Ghosh

Time. It is like an ocean wave. It comes and it goes, and once gone, never is to return.

Every day, countless people struggle trying to cope with the stress brought by their inability to manage time. Most of us have come across a situation where we felt trapped in the control of time's rush, failing to govern our time. It feels more as if it is time that manages us, and how much ever we try being in line with time, we fail. We fail practicing habits timely or fail maintaining a routine, no matter how much we try to do so. Psychology plays an important part in this happening too, for example, the phenomenon of revenge bedtime procrastination.

It was a casual day when a thought suddenly occurred to me. It could probably have solved our issue against time. Our relationship with time has to be a positive one. You might be startled to hear this and wonder how this is possibly relevant. Have you ever heard of the 'law of attraction' associated with the 'energy of thought'? You see, in the case of time, the law of attraction and the powerful energy of thought play a pivotal role in smoothening our mindset towards time and our relationship with time. We are to personify time into a positive being who supports us. For instance, if we constantly keep reinforcing the negative qualities of someone in our mind, those qualities of theirs are going to become more prominent, and if we create a positive image of the person in our mind, erasing the negative ones in our perspective of them, their negative qualities are slowly going to reduce while their positive ones get elevated. The same can be done with the case of the personified version of time, which is the humanized form of time we imagine to be like a normal person. We should think as if this person is not a barrier who is stopping us in our journey of life, but instead as someone who is a loving protector of ours. This might sound surprising, or even absurd at first, but scientifically, it is what it is.

The reason I firmly believe in this method is - one word - experience. Within a couple of days of practicing this technique, I received drastic changes and fruitful results. I felt myself being able to do tasks so much more profoundly and flexibly.

I would like to conclude by stating that this tactic of mine might grant a huge help to all those who are struggling with time and doing their utmost to cope with the control of time, just like it'd granted me.

চিত্র-শিল্পী: অমৃতা রক্ষিত

জানালা

সৌম্যা শিকদার

নিঃস্তব্ধতা খান খান করে বেজে উঠল দূরভাষ যন্ত্রটি — ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং। রাধা ফোন ধরতেই ও প্রান্তে মা এর অভিযোগ - "তুই কি, বলত? মোবাইল টা কি সাইলেন্ট মোডে রাখা? কিছুতেই ধরছিস না! অবশেষে খবর নিতে ল্যান্ড এ ফোন করলাম। এখন বাড়িতে? শরীর-টরীর ঠিক আছে তো?"

এক নিঃশ্বাসে কথা বলে মা অল্প হাফাচ্ছে। রাধা অপেক্ষা করে লম্বা শ্বাস নিল। সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেলল, "চাকরি টা আমি ছেড়েই দিচ্ছি মা"। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আর্তনাদ করে উঠল মা, "সে কি? কেন? তুই ই কি...!!" "না মা, ডিশিসান টা সম্পূর্ণ আমার"- অল্প ঢোঁক গিলে সাফাই গাওয়া ভঙ্গীতে রাধা বলতেই মা ভ্রু কোঁচকান। গলা টা একটু কেঁপে উঠল কি?

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী রাধার স্বপ্নই ছিল বড় চাকুরিজীবী হয়ে মা-বাবার পাশে দাঁড়ানোর। নিত্য অভাবের সংসারে ছোট আরও দুটি ভাইবোনের সঙ্গে বেড়ে ওঠা রাধা কৈশোর অতিক্রম না করতেই এই সারসত্যটি বুঝে গেছিল যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকের জীবনে। বিলাসবহুল জীবনচর্যায় কিংবা সহজেই প্রয়োজনীয় অথবা অপ্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদা পূরনের বাহুল্যে যারা অভ্যস্ত, তাদের হয়ত অঅর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে একটু সমস্যা হয়। রাধার মতন মেয়েদের ক্ষেত্রে সংসারের হা-মুখ কিংবা অনেক কিছু না পাওয়া টা একটা জেদ তৈরী করে দেয় — নির্দিষ্ট একটা সংকল্পের পথে এগিয়ে চলবার জেদ, সমস্যার সমাধান করবার জেদ।

সেভাবেই প্রাণপণ তৈরী করেছিল রাধা নিজেকে, মেধা, অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমের জোরে সমস্ত বাধা পেরিয়ে সাফল্যের মুখ দেখেছিল অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে। তাই আজ যখন এ হেন রাধা উচ্চারণ করল কথাটা, মেয়ের আর্তিতে বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল নীপাদেবীর। শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত বেয়ে নামল; তবে কি বিয়ে টা...!!

"খোকা, এবার কিন্তু শক্ত হাতে রাশ টা ধরার সময় এসেছে, অনেক তো হল বাইরে গিয়ে ধিঙ্গিপনার ! চাকুরীর নামে বারমুখো হয়ে দিনরাত কাটানো। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন এসে জুটেছে ওই আবৃত্তি-দল...কেতা করে আবার ডাকা হয় বাচিক শিল্পী! এবার সংসারে একটু মন দিক্! আমি এই বয়সে একা হাতে কতদিক সামলাই বল্ তো!!" চূড়ান্ত অভিযোগের সুরে শাশুড়ীর হিসহিসিয়ে নিজের ছেলেকে বলা কথাগুলো পাশের ঘরের দেওয়াল ভেদ করে কানে এসেছিল রাধার। যদিও এসব খুব একটা নতুন কিছু নয়, তবু হৃদপিন্ড থেকে কিছুটা রক্ত চলকে উঠল, যখন অভিরূপ কে বলতে শুনল, "চিন্তা কোরো না মা, চাকরি ওকে ছাড়তে হবেই। বাচ্চার সঠিক দেখভালের জন্য সব মায়েরাই একটা সময় এই সিদ্ধান্ত নেয়"। রাধা মনে মনে প্রমাদ গোনে কঠিনতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার জন্যে।

চিত্র-শিল্পী: অমৃতা রক্ষিত

চিত্র-শিল্পী: অমৃতা রক্ষিত

"বৌমা, কাজের লোকের কাছে কি আর বাচ্চা মানুষ হয়? মানছি, ছ-টা মাস সময় দিয়েছ তুমি ছুটি নিয়ে। তা বলে এখন বছর ঘুরতে চলল...দাদুভাই সবে চিনতে শিখেছে, হাঁটতে-চলতে শিখছে, মুখে বুলি ফুটছে; বলি, এ সময় কি মা'কে কাছে পাবে না? এ কেমন ধারা নিয়ম বাপু?" শাশুড়িমা এর কথায় রাধা সকালের শত ব্যস্ততার মাঝেও শান্তভাবে বলবার চেষ্টা করল, "মা, আমি তো আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। বাড়ির কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করি। বাবুসোনার খাবার নিজেই বানাই। ফিডিং এর জন্য ব্রেস্টমিল্ক জমিয়ে রাখছি বাড়িতে। যে সময় টা বাইরে থাকি, ওই সময়টুকু আয়া দেখছে তো!" শেষের কথাগুলোয় এক অসহায় আর্তি ফুটে উঠল রাধার কন্ঠস্বরে। অধৈর্য্যভাবে শাশুড়িমা - "কালে কালে কত আর দেখব মা! দুধের শিশুটিকে বাড়িতে ফেলে রোজগেরে হতে বাইরে যাচ্ছ? আমার সংসারের এমন সুরাহা তো আমি চাই নি! আমার খোকা কি এতই অপারক?। সে কি পারবে না এ ক'জনের অন্ন জোগাড় করতে?" অপরাধবোধে কুঁকড়ে গেল রাধা। অসাড় হয়ে এল জিহ্বা।

রাতের রোজনামচা এখন প্রায় একই। প্রথমে কাছ ঘেষে ঘন হয়ে আদুরে গলায় অভিরূপ শুরু করে, "তুমি দেখো রাধা, আমি সব সামলে দিতে পারব একলাই। তুমি ঘরে মন দাও সোনা। ছেলে বড় হলে তখন নাহয় আবার চাকরি করবে"! রাধা কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না যে সরকারি চাকুরী এত সহজে পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা, অনেক শ্রম, অনেক ধৈর্য্যের ফসল এই চাকুরী! অল্পেই রেগে যাওয়া অভিরূপ মেজাজ সামলাতে পারে না। উত্তপ্ত, উৎতক্ত হয়ে তীব্র ভৎসনা ও চিৎকারে পর্যবসিত হয় প্রতিটি রাত্রি। ঝগড়া বা তর্ক রাধার স্বভাববিরুদ্ধ। সহজাত সহবতের সাথে যেটুকু উত্তর দেবার, সেটুকুও বলতে পারে না সে তোপের মুখে।

স্বামী-শাশুড়ীর এই দু-মুখী রোষানলের সামনে তুষের মতন পুড়তে থাকে ছোটবেলা থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভোর মেয়েটির মন। সাথে ভীড় করে আসে কুন্ঠা, অজানা এক অপরাধবোধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

আচ্ছা, আরও কত মহিলা তো সংসার-বাচ্চা মানুষ করা-চাকুরী সবই একসাথে করছে। পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলোতে? সেখানে তো পুরুষ ও মহিলা দুজনেই সমান তালে পা ফেলে চলছে বাইরের জগতে। বিদেশে তো শ্বশুর-শাশুড়ী অথবা বাবা-মা এর সাপোর্ট সিস্টেমটাও বিরল। বাচ্চাগুলো ক্রেশ-এ রেখে মানুষ হচ্ছে না? আসলে সেখানে হাউস-ওয়াইফ কিংবা হোমমেকার বলে ধারণা টি মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। সেসব দেশে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। ভারতীয় কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মেয়েদের মতন কিছু না হলে অথবা কিছু না করেই বিয়ের অপশন টা খোলা সেখানে থাকে না। কিন্তু, এখন তো শোনা যায় দিন পালটেছে? ২০২১ এ দাঁড়িয়েও সেই বস্তাপচা ধ্যানধারণা তো পাল্টায়নি একটুও? যে, সন্তানের জন্য নিজের কেরিয়ার কিংবা জীবিকার ত্যাগস্বীকার করবে শুধুমাত্র মা? এই কি নারী-পুরুষ পায়ে পা মিলিয়ে চলা? বিভাজন রেখা তো ভারী সুস্পষ্ট!!

"বৌদি দি...বৌদি দি গো! দোরটা খুলবে গো একটু?" বাড়ির ঠিকে কাজের লোক চন্দনার কন্ঠস্বরে স্তরে স্তরে নানা জাল বুনে চলা চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায় রাধার। ছেলেকে পাশে শুইয়ে রবিবার দুপুরের এই অবসর। অভিরূপ বাইরে, শাশুড়ীমা দিবানিদ্রায়। তাঁদের আজই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আশ্বস্ত করবে ঠিক করেছে রাধা। নিত্য অশান্তির হাত থেকে মুক্তি।

গতকাল খানিক আগেই অফিস থেকে ফিরে মা-এর ফোন ধরে নিজের চাকুরী ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অবধি মরমে মরে আছে রাধা। মা এর তো কম কিছু অবদান নেই ওর পড়াশোনা চালিয়ে যাবার পেছনে!! চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ের সম্বন্ধ এলেই মা-এর রুখে দাঁড়ানো, নিজের সামান্য সঞ্চয় বিনাবাক্যব্যয়ে দিয়ে দেওয়া রাধার যেকোন প্রয়োজনে, রাত জেগে সেলাই করা পয়সায় ছেলে-মেয়েদের সঠিক পুষ্টি জোগাতে ফল-টা, দুধ-টা কিনে আনা, কিকরে এগুলো ভুলতে পারে রাধা?

কিন্তু চন্দনা এ সময়ে? রবিবার বিকেলে তো ও আসে না! ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দ্রুতপায়ে বাইরে এসে সদর দরজা খোলে রাধা। আরে ! চন্দনার হাতের ছোট্ট বেতের চুপরিতে একরাশ ফুল...! সুগন্ধে, ভালোলাগায় প্রাণমন ভরে গেল রাধার। "কি রে, তুই এ সময় এ? এত সুন্দর ফুল কোত্থেকে নিয়ে আসছিস?"

একগাল হেসে চন্দনা বলে, "বস্তিতে আমার ঝুপড়ির সামনে যে একফালি জায়গা টা গো, সেখানেই বাগান বানিয়েছি। তুমি তো আর গেলেই না গো বৌদি দি। বাবুসোনা আর তোমায় একদিন নিয়ে যাবই যাব।"

অবাক চোখে রাধা বলে, "এত সময় তুই পাস কি করে চন্দনা? তোর মেয়েটিও ছোট ক্লাসে পড়ে। তুই ৫/৬ বাড়ি কাজ করে আবার নিজের বাড়ির সমস্ত কাজ করিস। বর তো শুনেছি সারাদিন ডিউটি। ফুলটাইম অটো চালায় সে। এত সবের মাঝে আবার বাগানও করেছিস?"

"বৌদি দি গো,শখ থাকলে সবই সম্ভব। আমি আর আমার বরটা- দুজনেই বাগান খু...উ...ব ভালোবাসি। আর কি কান্ড, আমাদের দ্যাখাদেখি মেয়েটারও গাছের শখ জন্মেছে গো"।

"আচ্ছা চন্দনা, একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে রে। কিছু মনে করিস না। তোর বর তো অটো চালিয়ে মন্দ রোজগার করে না। তোকে ও কখনও বলে না, যে ঘরেই থেকে মেয়ে মানুষ কর... লোকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে রোজগার করবার কি দরকার? বলে না তোকে কখনও"? এক নিঃশ্বাসে কিসের এক ঘোরে বলে চলে রাধা।

"কাজ তো আমি নিজের ইচ্ছেয় করি গো! বর কেন বাধা দেবে? ভগবানের কৃপায় তার রোজগার ভালো, সে মানুষ টা মদ খেয়েও পয়সা ওড়ায় না। সঞ্চয় করে আমাদেরই জন্য, মেয়ের জন্যে। যদি কখনও বস্তি থেকে বেড়িয়ে নিজেদের একটা মাথা গোঁজার জায়গা করতে পারি! স্বপ্ন দেখি গো বৌদি দি দুজনে মিলেই। আমার রোজগারে সংসারের যেটুকু সুরাহাই হোক, বরের কাছে তো হাত পাততে হয় না! এই ধর গিয়ে ইচ্ছে হল কলাটা, মূলোটার কিংবা মেয়েটার কোনো শখ, বায়নার জিনিস – ওই একলা মানুষটির ওপর সব কি করে চাপাই বলো তো! সেও জানে আর খুব ভালো করে বোঝে গো যে আমি সংসার কে ভালোবেসেই তার মতই দিনরাত এক করছি। ভালোবাসা কি, বুঝি না গো বৌদি দি, কিন্তু সে মানুষ টা আমায় আর একটা মানুষ হিসেবেই সম্মান করে। সে দৃষ্টি তার চোখে দেখেছি গো। কি জানো, আমাদের মতন পরিবারে সারাদিন ঘর-সংসার-বাচ্চা আগলে বসে থাকার আরামটা, তোমরা যাকে বল বিলাসিতা, সেসব মানায় না কো। নিজে খেটে খাওয়া তেই সুখ আমাদের"--- তৃপ্তি ঝরে পড়ল চন্দনার গলায়।

মোহাবিষ্টের মতন হা করে চন্দনার কথা শুনে চলেছিল রাধা। কেন এভাবে ভাবল না সে? 'নিজে খেটে খাওয়াতেই সুখ'- কি অদ্ভুত তৃপ্তিভরা ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে কথাটায়!! কেন সে এত সহজেই কোণঠাসা হয়ে হঠকারী, নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে গেছিল? কোথায় গেল তার লড়াকু মনোভাব? একের পর এক কঠিন পরীক্ষার হার্ডল পেরিয়েই সে অর্জন করেছে সাফল্য। তবে নিজের জীবনের এই ছোটোখাট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে ঘাবড়ে গেল কেন সে? ভালোবাসা পাওয়া যায়, বস্তুনিষ্ঠ এ পৃথিবীতে সম্মান টা কিন্তু অর্জন করে নিতে হয়। নিজের কষ্টার্জিত জমি ছেড়ে দিয়ে ত্যাগস্বীকারে কোনও মহত্ব নেই। নতুন করে সব ভাবতে হবে আবার। বস্তুতঃ ভাবনার কোনও অবকাশই নেই। সামনে যে অনেক কাজ... বুদ্ধিমত্তার জীবনযুদ্ধে জয়ী সে হবেই!!

চন্দনা যেন রাধার মনের বন্ধ হয়ে যাওয়া, জং ধরে যাওয়া জানালা গুলো একটার পর একটা হাট করে খুলে দিল....! আহ্..! জুঁই,চাঁপা,বেলী,গন্ধরাজের সাথে একপশলা বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধও যেন ভেসে এল চতুর্দিক দিয়ে! হাল্কা মনে বুক ভরে অক্সিজেন নিল রাধা। তার সামনে আলো হয়ে দাঁড়িয়ে যে পৃথিবীর সুখীতম মানুষ টি!!

চিত্র-শিল্পী: সানভী শ

RABINDRANATH TAGORE'S VIEWS ON EDUCATION

Chandrima Guha Roy

Rabindranath Tagore was primarily an educationist rather than a political thinker. He put emphasis on 'naturalism' for framing educational model. In education, freedom is the basic guiding force for inculcating interest within a student who will derive inspiration from nature to pursue any branch of knowledge he likes. The establishment of Shantiniketan fulfilled the desired goal of Tagore in the educational front.

Unity of West and East:

Tagore's education marked a novel blending of the ideas of the East and West. The spiritualism of Indian philosophy and progressive outlook of the western people were blended together to give rise to an educational philosophy which marked its distinction in comparison to other educationists of India.

Natural growth in natural circumstance:

Tagore envisaged that nature is the best teacher to the pupil. Nature will provide the student with necessary situation to earn knowledge. No pressure should be exerted upon the student to learn any thing. It is nature which will be the guiding force to inculcate the spirit of learning in the mind of a student to pursue the education he likes. It will shape his behaviour and character.

Goodbye to book-centered education:

For the first time in the arena of education, Tagore established a new mile-stone. With boldness and firmness, he rejected a book-centered education for students. To him it is not just to confine the mind of boys and girls to text-books only. It will kill the natural instincts of a student and make him bookish. It will kill his creative skill. So, students should be freed from the-book-centered education and should be given a broader avenue for learning.

Freedom to learner:

Tagore had championed the cause of freedom. The same he wanted to implement in the field of education. With that object he had opened Shantiniketan, Sri Niketan and Brahmachari Ashram. Accordingly, he gave free choice to students to develop their interest in any field they like. To him, education should be after the heart of a man. He explained freedom in three-categorized ways i.e. freedom of heart, freedom of intellect and freedom of will.

Education imparted in a natural way will lead to the fulfillment of these three freedoms. One may pursue the vocational education or education of an intellect, or education in any branch of the arts or one may become a sansei by observing celibacy.

Teaching – practical and real:

According to Tagore, teaching should be practical and real but not artificial and theoretical. As a naturalist out and out, Tagore laid emphasis on the practicality of education. That will definitely increase the creative skill within a learner. That creativity will bring perfection in the learning process and the student will be a master in his own field but not a slave to mere theoretical knowledge which one delves deep.

Place of fine arts (dance, drama, music, poetry etc.:

Tagore attached great importance to the fine arts in his educational curriculum. To him, game, dance, music, drama, painting etc. should form a part of educational process. Students should take active part in these finer aspects of human life for these are very essential to enrich soul.

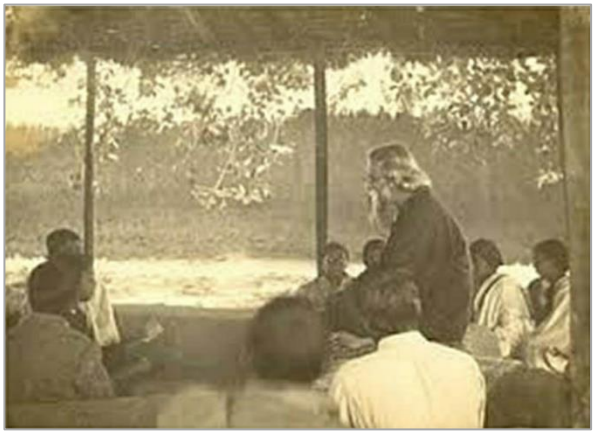

In his words "Speaking is for mankind and music for nature speaking is clear and limited by its needs; whereas music is mystic and expressive for a romantic eagerness. That is why; speaking creates nearness between man and man, while music helps us to identify ourselves with nature. When the harmonies of sounds are released with our expression then speaking loses much of its limited significance, but on the contrary getting together of the two muses had an all pervading character".

Education for rural reconstruction:

Tagore was aware about the rural poverty of our country. So, he wanted to eradicate it through education. The practical training imparted in different crafts to the students will make them skilled artisans in their field. They can remove the poverty of the rural bulk by applying their education helping thereby in the process of rural reconstruction.

"The highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence" - Rabindranath Tagore

চিত্র-শিল্পী: অদৃজা ভট্টাচার্য

CHOWLET

Ayantika Mukherjee

Preparation Time: 20 Min

Cooking Time: 10 Min

Ingredients:

Thin Noodles – 250 gm

Egg – 4 pieces

Milk – ½ cup or as needed (to dilute)

Onion – One medium sized

Green Chili – 2 pieces (as per taste)

Oil – As needed

Salt – As per taste

Pepper powder – As per taste

Directions:

1. Soak the noodles in warm water for 15 minutes or until soft.
2. Do not overcook the noodles – "Al Dente" only.
3. Cut the onion & Green chili in small pieces.
4. Take a bowl & mix the soft noodles, cut onions & cut chilis.
5. Add salt as per taste.
6. Break 4 eggs into the bowl.
7. Add the Milk to make it moist & soft.
8. Add pepper powder as per taste (Avoid for children).
9. Mix well all ingredients.
10. Heat a frying pan and pour cooking oil for shallow fry.
11. Pour a portion of the mixed batter in the frying pan.
12. Fry as pancake sizes.
13. Flip over once its brown on one side. Fry from both ends.
14. Serve Hot with Tomato Ketchup.

আজব চিকিত্সা

অরূপ কুমার চক্রবর্তী

সর্দি হয়ে দুদিন ধরে
নাক হয়েছে বন্ধ,
সত্যি বলছি বিশ্বাস কর
পাচ্ছি না আর গন্ধ।

জিভে এখন পাচ্ছিনা স্বাদ
লাগছে সবই খাট্টা
এসব শুনে নরেণ খুড়ো
মারলে পাঁচটা গাঁট্টা।

ফচকে তেনার ছোট্ নাতি
একরত্তি আর দস্যি,
আমার নাকে ঠেসে দিলে
দাদুর ডিপের নস্যি।

দাদু নাতির অত্যাচারে
হলাম বড় জব্দ,
গলাটাও বন্ধ হলো
নাই মুখে আর শব্দ।

হাতুড়ি হাতে বৈদ্য এলো
সঙ্গে বড় কাস্তে-
মুণ্ডুটাকে কাটবে বুঝি,
জোরে কিংবা আস্তে!

নাড়ি টিপে বৈদ্য বলেন
অসুখ বড় কঠিন,
নিম পাতা আর চিরেতার জল
খেতে হবে রোজ তিন টিন!

রঙ বেরঙের পাচন বড়ি
দিলেন মুখে ঢেলে,
খাওতো খোকা ওষুধ খানা
কপাত করে গিলে।

এবার বাছা চোখটা খোলো
দেবো লঙ্কার গুড়ো,
এবার বুঝি প্রাণটা গেল,
করছে কি এই বুড়ো?

প্রাণ বাঁচাতে এক ছুটেতে
হলাম পগার পাড়,
খাট থেকে তাই আছাড় খেয়ে
ভাঙল কটা হাড়।

চোখটা খুলে চেয়ে দেখি
মায়ের কোলে আমি,
সজল চোখে আদর করে
খাচ্ছে অনেক হামি।

ও মা! এ কি স্বপ্ন ছিল?
দিব্যি আছি খাসা,
চোখ মেলতেই পেলাম আমি
মায়ের ভালোবাসা।

স্বপ্নামৃত

প্রদীপ ঘোষ

যদি ঘুম ভাঙ্গালে তবে তোমাকেই বা ঘুমোতে দিই কেমন করে
এস... আজ গল্প করি নক্ষত্র রাতে হাতে রেখে হাত ।
মনে কি পড়ে .....কর্ণেটের বাজনায় চমকে উঠেছিলে যাত্রারাতে
আমার বুকের পর থেকে আমার কাঁধের ভরসা থেকে !
সারারাত তারাভরা যাত্রাপালা হয়েছিল,
তখন হেমন্তকাল উৎসবাসান ...
এক রাত্রি উৎসবে কেটেছিল বাতাসের বাঁশীর আওয়াজে
রূপকথার বীজ বুনতে বসেছিলাম নকশিকাঁথা মাঠে
সেইরাতে ছিল না ঘুম দুজনের চোখে ।
আজও যদি ঘুম না আসে, তোমাকেও হবে জাগতে ।
সে সব দিন আসবে না স্মরণে তোমার...
অমরাবতির প্রাসাদে তখন ঘুমঘোর নিস্তব্ধ,
তমসার পথ চিরে গোপন ইশারায় তোমার আভিসার !
এসেছিলে আজকের মতো আরও এক নক্ষত্র আকাশের তলায় ।
সেই থেকে কি শুরু হয়েছিল যাত্রা গোপনে, গভীরে?
তার পরেও কেটে গেছে কত পূর্ণিমা রাত
অমাবস্যার অন্ধকারের বহুযোজন দূরত্বে
না বলা কথা ঢেউ তুলে সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে।।
সেই রাতের অঝোরে বৃষ্টির শহরের কংক্রিট কর্কশে
ঘোলাটে চাঁদের উপর দিয়ে ক্রন্দনরতা মেঘ্,
আমার খবর নিয়ে পৌঁছেছিল, জাগরিত তোমার কাছে
তুমিও ঘুমোওনি সাদা কালো বিবর্ণ সেই রাতে ।
আবারো জাগিয়ে রেখেছ , তুমিই বা ঘুমবে কি করে !
আনেক গল্প অপেক্ষা করে আছে,
এবারেও যদি না শুনতে চাও, থাকব চুপ করে
বয়ে যাবে নদী বাওয়ার দিনগুলোর কথা ..বুকের পরে ;
পাহারের উপত্যকা থেকে অধিত্যকায় ফিরে বেড়ানোর নেশা !
এই সব আরও কত কি আমলিন অমৃতময় চিত্রপট ।
জাগিয়ে রাখবে তোমায়, শান্তিতে ঘুমবো আমি ...একা ।

VOICE...

Sunipa Dutta

Tears roll down her eyes
She, swallows her bitter feel...
Can you hear her voice!
It seeks long to speak!
Can't she whisper?
"No"! says the norms.
Silent goes her heart,
Silent, she keeps her mouth.

No voice but yet- expressions...
Voice, through the tapping fingers,
voice through the restless feet,
voice through the nasty headache,
voice through the sufferings of reflux,
voice through her anxious looks,
voice in her anguish,
voice in the wrinkles on her forehead,
Oh! Voice, when will you speak up?
Speak out loud, you voice!

Let the voice be voiced.
Let the dialogue begin!
Let the voice be voiced.
Let the dialogue begin!

You are the power,
You can be all,
You are the canvas.

You are the colour of expression.
You are the painter's art.

Sing the song,
Bring the rhythm
Breathe out the voice,
Let it begin.
Oh woman! You are the voice,
Bring the glory,
Do not wear the frown.
You are glorious
You are merry,
Wear the crown!

Ascend your voice
You are meant to be free,
To voice your choice.

NATURE

Agniabha Chakraborty

Nature provides us with essentials that we need
We should be very thankful indeed
Nature is truly our best friend
It gives us everything till the end.

Every single tree we see
Gives us all we need for free.

And let's not forget the bees that give us honey
The Sun that makes everyday sunny
Nature is more precious that any amount of money.

All of us, children, woman and man
Should preserve nature as much as we can.

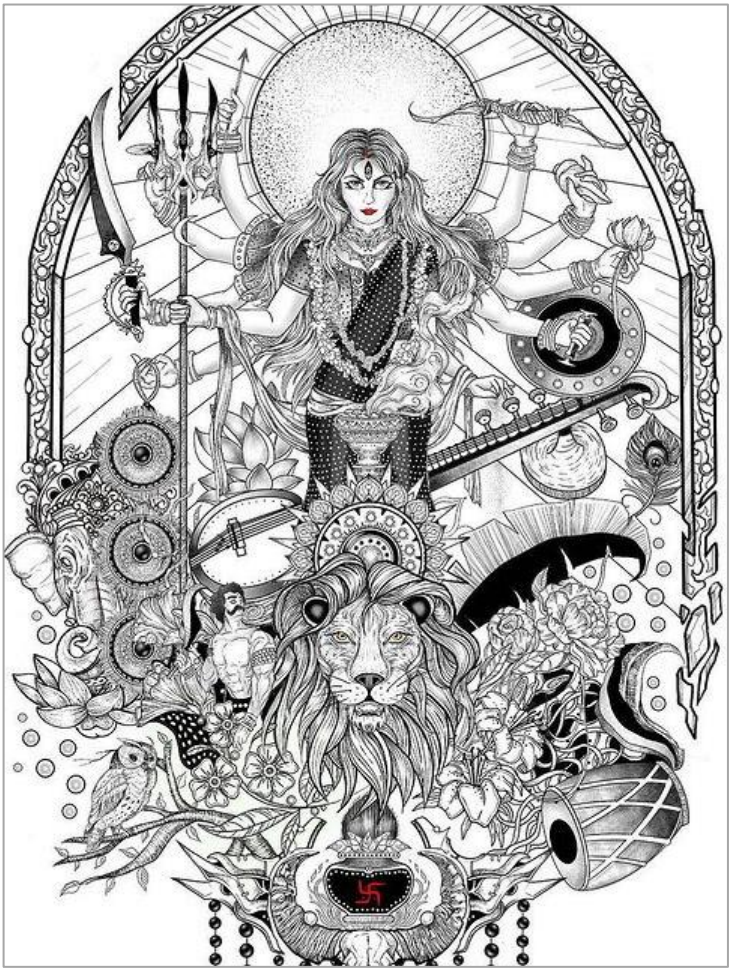

চিত্র-শিল্পী: শৌর্য চক্রবর্তী

জীবন মানে?

বিজন কুমার চৌধুরী

জীবন মানে ভীষণ এক, মস্তবড় চিহ্ন?
জীবন মানে কিছু পাওয়া, কখনো বা শূন্য।

জীবন মানে এগিয়ে চলা, কখনো বা রুদ্ধ
জীবন মানে হোঁচট খাওয়া, কেবল শুধু যুদ্ধ।

জীবন মানে এঁকে বেঁকে, চলা নদীর বাঁক
জীবন মানে কল্পনাতে, উড়াল পাখির ঝাঁক।

জীবন মানে কিছু হাসি, কিছু সুখের মেলা
জীবন মানে গড়িয়ে চলা, যেমন স্রোতের ভেলা।

জীবন মানে হতাশ মনে, কিছু আশার আলো
জীবন মানে সবাই বলে, এমনি চলা ভালো।

জীবন মানে ভালোবাসা, তাজা ফুলের ঘ্রাণ
জীবন মানে স্নেহ আদর, মাতাল করা প্রাণ।

জীবন মানে যুদ্ধে যাওয়া, যৌবনেরই গান
জীবন মানে ঝাঁকিয়ে চলা, তরতাজা একপ্রাণ।

জীবন মানে বিলিয়ে দেওয়া, দেশ মানুষের জন্য
জীবন মানে হাত বাড়ানো, তবেই জীবন ধন্য।

জীবন মানে নিত্যগড়া, জীবন স্মৃতির গল্প
জীবন মানে ভাগ্য গড়া, বাকী থাকে অল্প।

জীবন মানে স্বপ্নে গড়া, কল্পনারী নেত্র
জীবন মানে পটে আঁকা, ক্যানভাসে ঐ চিত্র।

জীবন মানে মা-বাবারই, আঙ্গুল ধরে চলা
জীবন মানে দাদু দিদারই, কল্প কথা বলা।

জীবন মানে চপল বালক, ঝাঁপিয়ে পরা জলে
জীবন মানে গ্রাম্যবালা, চপল পায়ে চলে।

জীবন মানে যৌবনেরই, প্রেম পূজারী মন
জীবন মানে স্নেহের পরশ, মায়ের প্রাণের ধন।

জীবন মানে শ্রমে ঘামে, দুরন্ত সংগ্রাম
জীবন মানে শ্রমজীবীর, ওষ্ঠাগত প্রাণ।

জীবন মানে ক্লান্ত দেহ, বিষণ্ন এক স্মৃতি
জীবন মানে ফেলে আসা, হতাশ মনের ভীতি।

জীবন মানে আর কোটা দিন, বেঁচে থাকার আশা
জীবন মানে চলে যাওয়া, নিরুদ্দেশের বাসা।

জীবন মানে শেষ জীবনের, অভিজ্ঞানের বোঝা
জীবন মানে শিরদাঁড়াকে, রাখতে হবে সোজা।

চিত্র-শিল্পী:
ঐশানী মুখার্জী

চিত্র-শিল্পী:
কৌশানী মুখার্জী

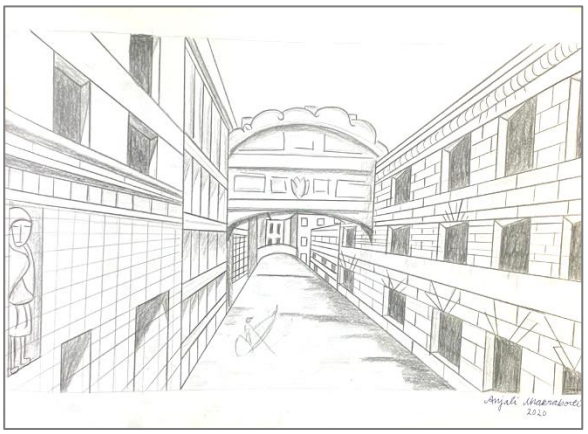

চিত্র-শিল্পী: অঞ্জলি চক্রবর্তী

ফেবুতে কাবু

সৌম্যা শিকদার

সকাল হতেই চোখটি খুলে ভাবলে দিদি- 'বেশ !

আজকে এমন ছবি দেব কাটবে না তার রেশ ...
লিলি মিলি ঊমা রুমা গুজ্জু শিল্পা শা-
চক্ষু হবে ছানাবড়া, মুখটি হবে হাঁ"
যেই না ভাবা সেজেগুজে বরকে দিলেন ঠ্যালা
'ওঠো বাপু বিছনা ছেড়ে, ঘুম হয়েছে মেলা !'

রবিবারের সকালটুকু শীতের আমেজ নিয়ে
ভেবেছিল বর বাবাজী কাটাবে ঘুম দিয়ে।
ধাক্কা খেয়ে চটকানো ঘুম -ভেস্তে যাওয়া সুখ
ভোলেবাবার সাজেই সে যে চলল - ব্যাজার মুখ।
শুরু হল যাত্রা এবার শীতের ভেজা পথে
ভোলেবাবার সদ্য কেনা i-20 রথে।

উঠল ছবি অজস্র যে নদীর পাড়ে- বাঁকে,
ফুলবাহারী পার্কে গিয়ে নানান গাছের ফাঁকে।
'স্কার্টের ডিজাইন এমনি রবে- চুলের খোলা বাহার'
ছবি তুলে ক্লান্ত 'ভোলে' জোটেনা তার আহার।
চলল তোলা ছবি শুধু সারা সকাল জুড়ে
নানানরকম সাজপোষাকে দিদির শরীর মুড়ে।

কখনো বা জলের ট্যাংকে আধেকখানি উঠে
চলতি গাড়ির রাজপথে বা তারই পাশের ফুটে।
ময়দান বা ভিক্টোরিয়া কিম্বা চিড়িয়াখানা
বাজার বা চার্চ, মল বা হল হোক না কেবল থানা।
এমনি করেই প্রজেক্ট সেরে ফিরল দিদি ঘর
ভ্যাবলা মুখে ক্যাবলা দাঁতে পিছনে তাঁর বর।

সারাদিনের হাজার ছবি এডিট হওয়ার শেষে
কতেক ছবি আপলোডালেন দিদি বিবিধ বেশে।
রান্নাঘরের বায়না ছেড়ে Swiggy দিল খাবার
ফেসবুকেতে তাকিয়ে দিদি অপেক্ষাতে এবার।
কিন্তু এ কী ! লাইক বা কমেন্ট এলো না তো সাথে !
অন্যদিনে যা কিছু দেন পড়তে পায় না পাতে।
সারাদিনের শ্রমের শেষে এ কী হল প্রভু !
এমনতরো পানসে হালৎ হয়না তো হায় কভু !

দূরে বসে হোমওয়ার্কে ব্যস্ত ছিল মেয়ে
মুচকি হাসি লুকোবে না তাকাও যদি চেয়ে।
রিন্টিসোনা বকুনি খায় মায়ের কাছে রোজ
শোধ নেবে তার অন্যভাবে এই ছিল তার খোঁজ।
সকাল থেকে ছুটির দিনে সুযোগ পেল যেই
ফেসবুকেতে সেটিং বদল, ছবি কারোর কাছে নেই।
মা জানে তার আপলোডাতে, আর জানে না কিছু; আজকে এত ছবি দিলেও হায় লাইক এলো না পিছু..!

চিত্র-শিল্পী: স্বস্তিকা বসু

চিত্র-শিল্পী: সুমিতালী ঘোষ

আকাশে আজ রঙের খেলা

আদৃতা চক্রবর্তী

তারিখটা ছিল 26শে ডিসেম্বর, সময় মধ্যরাত্রি । Arctic explorer এর গাড়িতে চেপে ছুটে চলেছি জনমানবশূন্য বরফে ঢাকা এক পথ ধরে। উদ্দেশ্য একটাই, আকাশে রঙের খেলা নিজের চোখে দেখে চোখ সার্থক করা।

আজ বিকেলেই ট্রমসোতে এসেছি আমি, অরিন্দম ও আমাদের কন্যা আগ্নিআভা। নরওয়ের উত্তরে অবস্থিত এই ট্রমসো শহর উত্তর মেরুর খুব কাছে। এখানে এখন মেরুরাত (polar night)। এসময় উত্তরমেরুতে সূর্যোদয় হয় না। শুধু চারঘন্টার জন্যে সূর্যের মৃদু আলো থাকে। তাই মেরুরাতের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা আসে আকাশে এই রঙের খেলা দেখতে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই রঙের খেলাকে ***মেরুজ্যোতি*** বলে। উত্তরমেরু থেকে যে মেরুজ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় তা ***Northern Lights*** বা ***Aurora Borealis*** নামে পরিচিত।

হঠাৎ উত্তেজিত কন্ঠে পলিনা ড্রাইভারকে বলল "stop here"। গাড়ি থামলো। পলিনা হল আর্কটিক এক্সপ্লোরারের প্রতিনিধি তথা আমাদের মেরুজ্যোতি অভিযানের গাইড। আমাদেরকে এতক্ষণ Northern lights hunting এর পদ্ধতি বিশদ ভাবে বর্ণনা করছিল। মেরুজ্যোতি দেখতে পাওয়াটা যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে, তা হলো Kp index এবং আকাশ কতটা পরিষ্কার আছে, তার ওপর। আকাশে মেঘ থাকলে মেরুজ্যোতির দেখা পাওয়া মুশকিল।

প্রয়োজনীয় সমস্ত গিয়ার (ভারী জ্যাকেট,বরফের জুতো, হেডটর্চ ইত্যাদি) ইতিমধ্যেই আমাদেরকে সরবরাহ করেছে সে। পলিনার কথা শুনতে শুনতে পৌছে গেলাম সেই ছোটবেলার দিনগুলোতে, ভূগোল বইয়ের পাতায়। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত চার্জড কণা পৃথিবীর দুই মেরুর দিকে চৌম্বকখেত্রে আকর্ষিত হয়ে যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং নাইট্রজেন, অক্সিজেন বিভিন্ন গ্যাসের সংস্পর্শে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখনই উৎপন্ন হয় অপূর্ব আলোর ছটা। গোলাপি, সবুজ, হলুদ নানান রঙের আলোর খেলা দেখা যায় আকাশে। তখন কিন্তু বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। সত্যি সত্যি এমনটা হয় বুঝি?

উল্লসিত পলিনা চিৎকার করে উঠলো "guys come out I have spotted Aurora"। আমরা তো একথা শুনে আনন্দে আত্মহারা। একটু আগেই পলিনা বলছিল

মেরুজ্যোতি দেখতে পাওয়াটা কিছুটা ভাগ্যের ব্যাপার। দেখতে পাওয়া যাবেই এমন কোনো প্রতিশ্রুতি ওরা দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ওদের তরফ থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না এমনটা বার বার বলেছে আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেরুজ্যোতির দেখা পেলাম। দিগন্ত থেকে ঘন ধোঁয়ার মত উঠছে আকাশপথে আর তাতে হাল্কা সবুজ আভা। তারপর আরেকটি জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানেও একই রকম দেখতে পেলাম। তৃতীয় যে স্পটে এ গেলাম ট্রমসো শহর থেকে অনেক অনেক দূরে নরইজিয়ান সি এর ধারে, গাইড জানাল যে সমুদ্রের অন্যপ্রান্তে নাকি গ্রীনল্যান্ড। এসময় যা দেখলাম তা ছিল চোখধাঁধানো। আকাশপথে হাল্কা মিষ্টি চাঁদের আলো আর তাতে সবুজ গোলাপি নানান রং এর খেলা চলছে। একে বলে "ডান্সিং অরোরা"। গাইড বললো তার দেখা এবছরের অরোরা গুলোর মধ্যে এই দিনেরটি ছিল সেরাগুলোর মধ্যে একটি। প্রকৃতির এই অপরূপ রঙেরখেলা দেখতে পেয়ে যেন চোখ সার্থক হল আমাদের। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছি আর মনে পড়ছে, বইতে পড়া সেই কটি লাইন, মেরুজ্যোতি, সত্যিই তো এমনটা হয়, এমনটা দেখা যায়। মনে অনেক আনন্দ নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

Glimpses of Greece

Subhankar Biswas

"Tough Times Never Last, Tough people do". After living in a "virtual" world for quite some time, we were desperate to find the "real" world. In our quest for a real holiday, we traveled to Greece in June 21. In Greece, we were in the midst of sea of humanity.... people partying, soaking up the sun, visiting historical sites, embodying the triumphant nature of human spirit. My humble effort to share some key moments of our holiday, through the following photographs.

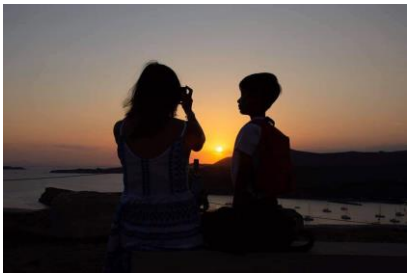

Spectacular Subset at Cape Sounio

Little Venice in Mykonos

View of Mykonos from top at dusk

Night View of Acropolis

The famous Blue Domes of Santorini

Change of Guard – Athens

Sunset at Mykonos

Volcanic Caldera in Santorini

জাঞ্জিবার @ তাঞ্জানিয়া

শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী

নড়ে চড়ে বসলাম! কাতার হলিডেজ (কাতার এয়ারওয়েস) থেকে দেখে প্রোমোশনাল মেইল (E-Mail) টা দেখে; কোয়ারেন্টাইন - ফ্রি হলিডেজ জাঞ্জিবারে। অমনি চনমন করে উঠলো আমার মনটা। সেই বিকেলেই পৌঁছে গেলাম কাতার এয়ারওয়েস টাওয়ার ১-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত কাতার হলিডেসের অফিস। অফিস নিয়ন্ত্রক সুন্দরী মহিলার কাছে একটাই দাবি, শুধু

জাঞ্জিবারে নয়, ট্যুরটা আমাদের একটু কাস্টোমাইজ করে দিতে হবে, তানজানিয়া যাবো আর জঙ্গল দেখবো না, সে আবার হয় নাকি! সেদিন হতাশ হয়েই ফিরলাম, কিন্তু পরের দিন আশার এল আবার জেগে উঠলো, শিল্পী যখন স্কুল থেকে যোগাযোগ জোগাড় করে এনে দিলো মিস্টার ক্রিস্টিয়ান আয়ও-র। কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করার দরুন শিল্পীর কিছু আফ্রিকান এবং সাউথ আফ্রিকান কলিগ জুটেছে, এটি এনাদেরই অবদান। জাঞ্জিবার, দার-এ-সালাম আর মিকুমি রিসার্ভ ফরেস্ট মিলিয়ে তৈরী করা হলো বেশ একটা ছিমছাম আর জমপেশ প্যাকেজর; ৭ দিন ৬ রাত। লার্সেন & টুব্রোর বড় বাবুকে টুক করে পটিয়ে জোগাড় হয়ে গেলো ৭ দিনের ছুটি, আর আমরা এবার প্রস্তুত, গন্তব্য তাঞ্জানিয়া ॥

৩০শে জুলাই ২০২১, ভোর ২:২০ কাতার এয়ারওয়েস ফ্লাইট QR১৩৫১ ধরে আমরা রওনা দিলাম; খুবিই সুখকর যাত্রা, সকাল ৮:৪০এ আমাদের ফ্লাইট জাঞ্জিবারে পৌছালো ! সমুদ্র সৈকত আর দ্বীপপুঞ্জের অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে গেলাম, যেন মনে হচ্ছিলো আরো কিছুক্ষন আকাশে পরিভ্রমণ করতে পারলে বেশ ভালো হতো, এই মনোরম সবুজ অরণ্য তার সঙ্গে নীল আভায়ে ঘেরা সমুদ্র ! আবিদ এমনি কারুমে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের, পর্যটকীয় যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা মিটিয়ে যখন বাইরে এলাম, দেখলাম আমাদের জন্য ক্রিস্টিয়ান একটা বড় এস ইউ ভি (SUV) গাড়ি পাঠিয়েছে আর তার ড্রাইভার মাইকেলের সাথে শহর ঘুরতে ঘুরতে আমার এগিয়ে চললাম আমাদের হোটেলে। জাঞ্জিবার যেন আর একটা লাল মাটির দেশ, বাংলার গ্রাম বা শহরতলির মতো মনোরম পরিবেশ, হিজিবিজি ট্রাফিক বা যানজট পেরিয়ে আমাদের গাড়ি, পৌঁছে দিলো লেজি বিচ হোটেলে। আর সেখানেই আমাদের প্রথম দেখা হলো আমাদের টুর ম্যানেজার আর গাইড ক্রিস্টিয়ান আয়ওর সঙ্গে, সে ওখানকারই ছেলে, বয়স ২২ কি ২৩ হবে, রোগা পাতলা চেহারা, গায়ের রং কৃষ্ণকায়, আর মাথায় ছোট ছোট ঘোরালো প্যাঁচালো চুল, ছুঁচলো থুতনি আর স্নিগ্ধ চোখ দুটো তার, সুন্দর কথাবার্তা, আমাদের স্বাগত জানালো একটা অতি সুস্বাদু মকটাইলের সঙ্গে।

জায়গাটার নাম কেন্দুয়া আর সেখানে আমাদের হোটেলের ছাদ লাগোয়া রেস্তোরা সান সি বার (Sun Sea Bar), বেশ ছিমছাম পরিবেশ, আলাপ হলো হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার আল্লাচিনোর সাথে। ছিমছাম পরিবেশ ক্রমে ঘরোয়া পরিবেশে পরিবর্তন হতে থাকলো! সামনে বৃহৎ সুইমিং পুল, সাথে জাকুজি, হোটেল সংলগ্ন সমুদ্র সৈকত জুড়ে অজস্র সাক্স বা খুপরি আকারে খর কুটো দিয়ে প্রস্তুত বিছানা রোদ পোয়ানোর সুউপযোগী; আরাম করে রেস্ট নিয়ে কাটিয়ে

দিলাম দু দিন। দৈনন্দিন কর্ম জীবনের সমস্ত ক্লান্তি যেন তলিয়ে গেলো ওই সুইমিং পুলে আর হোটেলের দারুন খাবার ব্যবস্থার সাথে সমুদ্রের ফুরফুরে হওয়া এনে দিলো শরীর মনে এক অদম্য শক্তি।

৩ নম্বর দিন সকাল সকাল জেমস এসে উপস্থিত আমাদের হোটেল দ্বারে, আমাদে আজকের গন্তব্য নেম্বা আইল্যান্ড। উদ্দেশ্য ডলফিন দর্শন আর সমুদ্রের অতল গভীরতাকে কাছ থেকে দ্যাখা, যাকে বলে স্নোর্কেলিং। আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মুয়ুনী সমুদ্র সৈকতে, আর তার পর আমরা চড়ে বসলাম একটা ছোট্ট ফেরি স্পিড বোটে। ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে, উথালি পাথালি হতে হতে আমাদের ফেরি এগিয়ে চললো মাঝ সমুদ্রে, এখানে সমুদ্রের রং আর সবুজ নয়, ঘন নীল এই সমুদ্র, অনেক দূরে আমরা ফেলে এসেছি মুয়ুনী সমুদ্র তট। কিছু দূরে শুধু হা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসহায় নেম্বা দ্বীপপুঞ্জ। আমরা মাঝ সমুদ্রে অপেক্ষারত, হঠাৎই রব উঠলো 'ওইযে ওইযে' দর্শন পাওয়া গেলো দল ছুট হওয়া দুটো ডলফিনের। প্রানপনে যেন ছুটে চলছে সমুদ্রের আরো গভীরে তাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য আর তারই মাঝে হঠাৎ হঠাৎ লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের মনোরঞ্জনের কোনো ত্রুটি রাখছে না। আমরাও তাদের পেছনে ধাবমান। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরো খান চারেক ফেরি, ফরাসি মহিলা হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে চেষ্টা করতে থাকলেন ওই

ডলফিনদের ধরে তাদের পিঠে চড়ে একসাথে সাঁতার দেওয়ার, তবে বহু চেষ্টা করেও সেই ইচ্ছে পূরণ করা সহজ না ! এবার দেখতে পেলাম এক ঝাঁক ডলফিন, যেন পারি দিচ্ছে এক সাগর থেকে অন্য সাগরে, আজ আরব মহাসাগর তো কাল তাদের ঘর বাড়ি সেই ভারত মহাসাগরে ॥

নেম্বা দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই পরে নিলাম গগলস আর স্নোর্কেলিং ব্রিথিং পাইপ বা মাস্ক, সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে যেই না ধাতস্ত হয়ে উপভোগ করতে শুরু করেছি সেই মনোরম শান্ত অথচ রঙিন স্নিগ্ধ দেশ, মনে পরে গেলো অফিসের কথা, আহা ! এমন শান্ত পরিবেশে যদি আমার একটা অফিস হতো ! কিন্তু হায় বিধাতা ! স্নোর্কেলিং পর্ব সেরে ফেরিতে উঠতেই উপস্থিত ফলাহার, শিল্পী আর তিথি অনেক আগে থেকেই ফলমূল সেবন করতে ব্যস্ত, আম তরমুজ শসা

কলা কেটে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আমাদের জন্য, সেই ফল খেতে খেতে আমরা নেম্বা আইল্যান্ড ছেড়ে ফিরে এলাম মুয়ুনীতে। পেটে ফুরফুরে খিদে নিয়ে এবার আমরা চলে আসলাম কেন্দুয়া, তবে এ কেন্দুয়া আলাদা, এখানে জমকালো রেস্তোরা, কেনা কাটার জায়গা, বড় বড় হোটেল, বড় বোট বা ক্রুজ, এক জমজমাট কেন্দুয়া। এখানে বলা আবশ্যক, ওখানকাকর চিত্র শিল্পীদের পেইন্টিং দেখে আমি অভিভূত ! অনেক ছোট ছোট আর্ট গ্যালারি এবং দোকান , যেখানে তাদের চিত্র প্রদর্শিত এবং এই চিত্র বিক্রি করেই তাদের জীবন নির্বাহ!

গ্রিল চিকেন, ফিশ এন্ড চিপস, সঙ্গে অরেঞ্জ জুস, দিয়ে লাঞ্চ সেরে অস্তমিত সূর্যটাকে অনুসরণ করতে করতে চড়ে বসলাম এক বিশাল পাল তোলা নৌকাতে, গিয়ে উঠলাম এক্কেবারে ডিঙার ছাদে। আঞ্চলিক গানের সুরে ও তালে কিছুখনের মধ্যেই মেতে উঠলো নৌকার প্রত্যেক পর্যটক। পাল উড়িয়ে নিয়ে এই পর্যটক বাহি নৌকা থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া দেখার অনুভূতি যেন একদম আলাদা, একদম বিরল, সেই গানের সুর কথা তাল আজ মনে বাজে আর আমরা মাঝে মাঝেই গেয়ে উঠি, '' জাম্বো ! জাম্বো বুয়ানা ! হবারি গানি , জুড়ি সানা....হাকুনা মাতাটা !!'' দেখা হলে একদিন এই সহেলি ভাষায় গানটা গেয়ে শোনাবো!

চতুর্থ দিন, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম জেমসের গাড়ি করে, অল্প সময়ের মধ্যেই ও আমাদের পৌঁছে দিলো স্পাইস ফার্ম (Spice Farm)। হরেক রকম মশলা সামগ্রীর গাছ গাছড়িতে ভরা, দেখলাম লবঙ্গ গাছ, সিঁদুর গাছ - যেখান থেকে সিঁদুর তৈরী হয়, আরো কত রকম ফুল, ফল যার বিভিন্ন রকম উৎপাদি সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা করেছে, কখনো ঔষুধ রূপে কখনো রান্নার উপযোগী মশলা রূপে।

এরপর আমরা যাবো স্টোন আইল্যান্ড বা প্রিসন আইল্যান্ড। জাঞ্জিবার পোর্ট থেকে রওনা দিয়ে, অদূরে গ্রেভ আইল্যান্ডকে নজরে রেখে যখন আমরা প্রিসন দ্বীপপুঞ্জে পৌছালাম, আমাদের উত্তেজনার সীমা ছাড়িয়ে গ্যালো ১৮৪ বয়সী বিশালাকায় কচ্ছপ দেখে। তিথি বেশ ভয়ই পেলো, তবুও বাবাইয়ের হাত ধরে তাদের কে বাঁধাকপির পাতা খাওয়াতে পিছপা হলো না। ওই দ্বীপপুঞ্জ আজ ২০০র বেশি অতিকায় কচ্ছপের বাসস্থান এবং সংরক্ষণকেন্দ্র ॥

প্রিসন আইল্যান্ড থেকে ফিরে এলাম জাঞ্জিবার শহরে, মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে দেখতে গেলাম জাঞ্জিবার ফোর্ট। ছোটোখাটো দুর্গ, মেরামতের কাজ চলছে, এক পাশে হাসপাতাল, অন্য দিকটা পর্যটকদের জন্য খোলা। এখানে অল্প সময় কাটিয়ে আমরা দেখতে গেলাম তানজানাইট স্টোন, উৎপত্তি স্থান শুধু এই তাঞ্জানিয়া।

বড় সুন্দর নীলাভ এই পাথর যেন হাতছানি দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার নীল আভা ॥

আজ তাড়াতড়ি ফিরে এলাম হোটেলে, ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম; সুটকেস আর ব্যাগ গুলো গুছিয়ে নিয়ে, খুব সকালে পৌঁছে যেতে হবে জাঞ্জিবার পোর্ট, লক্ষ্য ৪০ মিনিট সমুদ্র যাত্রার পরে দার-এ-সালাম, আর সেখান থেকে সোজা আফ্রিকার জঙ্গলে, মিকুমি ন্যাশনাল পার্কে। দার-এ-সালাম এ দেখা হলো আমাদের ফরেস্ট গাইড কাম রেঞ্জার জাকারিয়ার সাথে। টুরিস্ট গাইড ক্রিস্টিয়ানের সাথে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সন্তোষজনক ও সুপারিশযোগ্য; তানজানিয়া বা কেনিয়া (মাসাইমারা) ভ্রমণের কোনো পরিকল্পনা করলে আমাকে যোগাযোগ করতে ভুলে যেওনা, আমি নিশ্চয়ই সমস্ত যোগাযোগ তোমাদের দিয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করতে পারলে খুবই খুশি হবো। আগামী দু দিন আমরা আফ্রিকার জঙ্গলে কাটাই, সে আর এক দারুন অভিজ্ঞতা আর রয়েছে অনেক গল্পের ভান্ডার, যেটা জমে থাকলো পরের সংখ্যায় প্রকাশ পাওয়ার অপেক্ষায়। জাঞ্জিবারের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে, আজ এখানেই শেষ করছি, জঙ্গলের গল্প আবার হবে একদিন, অন্য কোনো অধ্যায়ে, কিংবা সাক্ষ্যাতে এক কাপ চায়ের সাথে ॥

এক দুষ্টু হাওয়া ভেসে আসে, সঙ্গে সাথী নিয়ে পাশে, আনমনে!
মিষ্টি নজর দিয়ে বলে, থাকবোনা আজ কোনো ঘরে, আনমনে!
লুকোচুরি খেলবো আমরা, দুষ্টুমিতে ধরবো ভোমরা,
ডুববে পাহাড় ভাসবে যদি, আকাশে ||
চল হাওয়া আজ যাবো সাথে, মাখবো ধুলো মাঝ মাঠে,
গাইবো গান আর করবো চুরি, বাতাসে ||

এভাবেও ফিরে আসা যায়

ত্রিনয়ন ও পর্ণিনী চ্যাটার্জী

কিষেণ সিং মেহতার চোখের কোণ টা চিকচিক করছিলো। ডেকচিতে চা ফুটেই যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই! আমাদের বাসটা তার দোকান লাগোয়া মোড় থেকে তখন রাজুজী ঘোরানোর চেষ্টা করছেন, সেই রাজুজী, গত দুই মাস এই বাসটাই যার বাড়ি ঘর। উঁচু নিচু সরু রাস্তা, বাস রাস্তার অভিমুখে ফিরতে ফিরতে সামনের একটি দুটি মুদিখানার দোকানিরাও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন।

পুলিশ চৌকির এস আই বাবু, অন্যদিন আমাদের দেখলেই এক গাল হাসি, "খবর বন্ রহি অপকী!" আজ যে তার কিসের এতো কাজ, ঘাড় গুঁজে রেজিস্টারের খাতায় এক মনে কী সব লিখে যাচ্ছেন!! এখনও কী খবর পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, একদম "উপর তক"!

একাই বসেছি সীটে। এখন দূরত্ব বাড়ানোর সময়, তফাৎ যাও স্লোগানের রব চারপাশে,প্রতিনিয়ত; কাছাকাছি এলেই যেন নিশ্চিত সর্বনাশ। কিন্তু এই যে দূরত্ব বাড়তে চলেছে, চোখের সামনে দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে হুহু করে সরে যাচ্ছে সব কিছু, কী করে তাকে আটকাই! টুকরো টুকরো দৃশ্য, স্মৃতি অবশ করে দিচ্ছে আমায়, ক্রমে যেন এক ঘোরে তলিয়ে যাচ্ছি, এক অমোঘ বন্ধন কে কাটিয়ে আসছি আর এক নিশ্চিন্তে আশ্রয়ে, যেখানে আমার ঘর।

আমাকে হারিয়ে দিলো সে, ভালোবাসার অদৃশ্য মায়াজালে পরম যত্নে সে বেঁধে রেখেছিলো আমায় এই দুটি মাস, আজ সে বন্ধন ছিন্ন করে চললাম। ফিরে আসার চেষ্টার অক্লান্ত লড়াই তে কখনও বুঝতেই পারি নি, ফেরার সময় মন টা ফেলে রেখেই ফিরতে হবে। কখন অজান্তে নিঃসারে বেরিয়ে আসা অশ্রু আমাকে তা আজ বুঝিয়ে দিয়ে গেলো, একে বারে বিদায় বেলায়।

একটু খোলসা করেই বলি। ২০২০র মার্চের সেই একুশ তারিখ থেকে আমরা বন্দী হয়ে গেলাম। আমরা বাঙালি, পায়ের তলায় সুড়সুড়ি তাই বছরভর। এবারের গন্তব্য ছিল কুমায়ুনের সেরা কিছু জায়গা। যেখানে এসে ফাঁসলাম, সে জায়গাটি অন্যদের তুলনায় সাদামাটা, চাকচিক্যহীন। নাম

চকৌড়ি, উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় জেলার এক ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ। একখানা পাকা রাস্তা তার বুক চিরে চলে গেছে, বাকী সবই কাঁচাপাকা পায়ে চলা পথ, উঁচু নিচু পাথুরে প্রান্তর। দোকান পাটের তেমন বালাই নেই, পাহাড়ের কোলে কোলে নিপাট এক সরল স্নিগ্দ্ধ গ্রাম্য চিত্র।

না, কিছুই নেই বলাটা হয়তো ভুল হলো। অহংকার করার মত তার যথেষ্টই কারণ আছে। যথা সময়ে তার কথা বলব। যাইহোক, ছয় ঘন্টা সফরের পর সেখানে পৌঁছালাম গিয়ে এক দুপুরবেলা। আকাশের কোণে তখন আমাদের মনের মেঘের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। পাহাড় দেখার মানসিক অবস্থায় আমরা তখন কেউ নেই।

সেদিন মুন্সিয়ারি থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে জানতে পারি অনির্দিষ্ট কালের জন্য তালা পড়তে চলেছে দেশে। যতক্ষণে জানলাম, দেরী হয়ে গেছে। নিচে কাঠগুদাম অব্দি ২৫০ কিমি রাস্তা নামার আর সময় নেই। রাতের শেষ ট্রেন টি ন' টার পর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। যদি এখানেই না থামি, তাহলে হয়তো স্টেশনেই অনিশ্চিত দিন যাপন করতে হবে! দলের বেশির ভাগ মানুষই বয়স্ক, তাদের নিয়ে পাহাড়ী পাকদন্ডী কাটিয়ে নিচে নামার অর্থ এক চরম ঝুঁকি নেওয়া। ড্রাইভার দা, রাজু জী আবার সন্ধ্যে বেলায় চোখে দেখেন কম। বলাই বাহুল্য চকৌড়ির সদ্ভাবনা রিসর্টে তার পরের দুই মাস আমরা অতিথি হতে চলেছি, সেই দূরদর্শিতা আমাদের সত্যিই ছিল না।

অতঃপর, এক অসম লড়াই এর সূত্রপাত, আর শুরু তার রঙ রসের মায়ায় বিভোর হয়ে যাওয়ার। এতটাই, দুই সপ্তাহ হলো প্রায় ফিরেছি, তবু প্রতিটি সেকেন্ডে মনের অণু পরমাণু তে তার জোড়ালো বিরাজতা।

ভেবেছিলাম লিখব এক যন্ত্রণাময় দিন যাপনের গল্প। কিন্তু লিখতে বসে কার্সরের গতি যেন বড়ই অবাধ্য। লিখতে চাইছি এক, লিখছি আর এক। যার থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছি, তার বাঁধন কাটিয়ে, মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছি, সে কী এক অদৃশ্য মায়াজালে আমায়, আমাদের জড়িয়ে ফেলেছে। ছোটো বড়ো, চারপাশে যাই দেখছি, বলছি চকৌড়ি তে হলে কেমন হতো।।বৃষ্টি তে মাটি ভিজছে এখানে, মনে পড়ছে শুধু ওখানকার বৃষ্টির বিহ্বল মুহূর্তগুলি। এখানকার গুমোট অস্থির হয়ে উঠছে সেখানকার বরফ পড়ার স্মৃতি দিয়ে। মনে পড়ে যাচ্ছে বারংবার কুয়াশার চাদরে ধীরে ধীরে কেমন অবশ হয়ে পড়ত সমগ্র চরাচর। মেঘেরা পাড়ি দিত আমাদের ঘরে, মনে ও! অজস্র পাখির কিচিরমিচির কেমন করে ঘুম ভাঙাতো প্রতিদিন ভোরে!

কিন্তু যাইহোক, ভাবনায় এভাবে বয়ে গেলে আমাদের যন্ত্রণার কাহিনীটাও হয়তো অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। দিনের পর দিন হিম শীতল পরিবেশের অনিশ্চয়তায় কী অসম যুদ্ধ আমরা জিতে এসেছি তার ব্যক্ততাও সমান গুরুত্বের দাবী রাখে।

ফিরে আসি সে কথায়। ২১ তারিখ থেকে ফেঁসে গেলাম আমরা। শেষ ট্রেন টাও ছেড়ে চলে গেলো আমাদের। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো গাড়ির খোঁজ, প্লেনের খোঁজ। সব ব্যর্থ। সমতলের সমস্যা এক, পাহাড়ের সমস্যা অন্য। ফ্লাইট ধরতে হলে পাঁচশো কিমি পাহাড়ি রাস্তা ডিঙিয়ে নিকটবর্তী দেরাদুন, দিল্লী বা লখ্নৌ পৌঁছানো দরকার, সময়ে কুলিয়ে ওঠা গেলো না। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় তখন আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শুরু হলো একে অপরকে দোষারোপের পালা। প্রচন্ড হীনমন্য মনে হতে থাকলো নিজেকে, এতোটা অজ্ঞান কী করে হলাম!! পরিস্থিতির উপর নজর ছিলই, কিন্তু তা যে এত দ্রুত হাতের বাইরে চলে গিয়ে আমাদের অকূল পাথারে ফেলে দেবে, সেই দূরদর্শিতা কেন তৈরী হলো না মনে!!

এবার আমাদের রিসর্টের কথা, চকৌড়ি গ্রামের কথা কিছুটা বলি। ট্যুর পার্টির সঙ্গে যাওয়া, তাই বিশাল একটা বিলাসবহুল রিসর্ট সেটি নয়, তবু ছিমছাম, পরিষ্কার পরিছন্ন এবং আধুনিক সুবিধাযুক্ত তো বটেই। গাছপালায় ঘেরা খোলামেলা পরিবেশের মধ্যে গড়ে তোলা সদ্ভাবনা রিসর্ট কে অন্য সময় দেখলে হয়তো এক নজরেই ভালোবেসে ফেলতাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে হোটেলের সেই এক কামরার ভিতরে কী ভাবে কতদিন কষ্ট সহ্য করতে হবে তা চিন্তা করে দম বদ্ধ হয়ে এসেছিল।

এদিকে রিসর্টের সব কর্মচারীরাই নিজের নিজের গ্রামে ফেরত চলে গিয়েছে করোনার রক্তচক্ষুর ভয়ে। মালিকের নির্দেশে কেবল রয়ে গেছে কেয়ার টেকার মনীশ পাঠক আর তার চেলা রাহুল। এই দুজন আমাদের রিসর্ট বন্দীদশার দিন গুলো তে যেভাবে আমাদের সেবা যত্ন করেছে, তা যতই বলব যথেষ্ট হবে না হয়তো। পাহাড়ী গ্রাম, ঘন ঘন কারেন্ট চলে যায়, জল থাকে না, দুপুরের পর থেকেই অসহনীয় ঠান্ডা, প্রায় প্রত্যেকদিন শীলাবৃষ্টি আরও এমন অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা দু'টো মাস কাটিয়েছি সেখানে, কখনও কখনও নিজেদের মনের অবসাদ প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহারেও। কিন্তু সদা হাস্যমুখ স্বল্পভাষী এই দুটি ছেলে আমাদের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত যা করে গেছে তা তাদের অতি অল্প মাস মাইনের তাগিদে কখনোই নয়। দশ কিলোমিটার দূর পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ওষুধ এনে দেওয়া থেকে, পানীয় জলের সরবরাহ সবটুকু দায়িত্ব পালন করেছে কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ সেবার মনেই।

যাই হোক, বাড়ির থেকে দূর, স্বজন দের ছেড়ে অতি শীতল এক প্রত্যন্ত পাহাড়ী গ্রামে আমাদের দিনগুলো প্রাত্যহিক চাহিদার নিরিখে আদৌ সুখকর ছিল না। একে এক নিরিবিলি গ্রাম্য জায়গা, তার উপর দেশ জুড়ে করোনার লাল ঝান্ডা, লক ডাউনের কড়াকড়ি, কার্যতই চকৌড়ি কে করে তুলেছিল জনমানবহীন সুনশান এক আধা ভৌতিক উপতক্যায়। আমাদের ২৭ জনের দল কে

তখন গ্রামবাসীরা গভীর সন্দেহের চোখে দেখে। কখনো জানলা দিয়ে উঁকি মেরে, কখনো বা টাকা নেওয়ার সময় হাতের বদলে প্লেট এগিয়ে দিয়ে তারা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতেন, আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি না।

তাদের এই ব্যবহারের জন্য অবশ্য আমাদের মনে তাদের প্রতি কোনও অসন্তোষ বা অভিমান নেই। বুঝি, সে সময়টাই ছিল অবিশ্বাসের! সমাজই তখন তাদের উপদেশ দিয়েছে, সকলকে সন্দেহের চোখে দেখতে, অপরিচিতদের দূরে সরিয়ে রাখতে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে লকডাউনের মাঝামাঝি সময় থেকেই ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষ রা ঘরের বন্ধ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। আমাদের ডেকে তারা খোঁজ নিয়ে যেতেন, আমরা কেমন আছি, কী খাচ্ছি আমাদের সুবিধা অসুবিধা সব কিছুর প্রতি ছিল তাদের স্নেহের নজর। এই সরল নিপাট গ্রামবাসীদের আন্তরিক ব্যবহারে আমরা সকলেই তাদের প্রাথমিক জড়তার দিনগুলি এক ঝটকায় ভুলে গেছিলাম। যারা বাড়ির গরুর দুধ দিয়ে, পুকুরের মাছ দিয়ে, এমনকি মন্দিরে ঈশ্বর সেবার চাল দিয়েও আমাদের সেবা করতে চেয়েছে, আপন করে নিয়েছে, আমাদের কষ্টে নিজেরা চোখের জল ফেলতে কার্পণ্য করে নি, তারা সর্বতকরণেই প্রমাণ করেছে, অতিথি দেব ভব! ভুলতে পারি না, চকৌড়ি তে আমাদের শেষের দিনগুলোয় নরম রোদের বেলা গুলো কাটতো তাদেরই কারুর উঠোনে অলস আড্ডা দিয়ে আর কখনও বা কিষেণ সিংয়ের দোকানে মোষের ঘন দুধের ধোঁয়া ওঠা চা খেয়ে।

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে যখন সমগ্র দেশ তালাবন্দী হয়ে ঘরে, তখন আমরা কী করে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালাম। প্রকৃতপক্ষে লক ডাউনের প্রথম দিকে আমরা ও হোটেলের চার দেওয়ালের ভিতর বা বড় জোর সামনের বাগানটিতে কেবল বেড়ানোর সুযোগ পেতাম। কিন্তু কিছুদিন পর হোটেলের বাইরে থাকা পুলিশচৌকীর মানুষগুলির হয়তো আমাদের বন্দীদশা দেখে খুবই মায়া লেগেছিলো তাছাড়া পিথোরাগড় জেলা বা তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে একটিও কোভিড পসিটিভ কেস না থাকায় হোটেলের সামনাসামনি ঘুরতে দিতে পুলিশ রা আর তেমন আপত্তি করেন নি।

এবার আসি তার কথায় যার কথা না বললে আমার চকৌড়ির গল্প অসম্পূর্ণ, অপাংক্তেয়। শুধুমাত্র সে ছিল বলেই আমি ফিরে এসেছি অক্ষত মনে। চুয়ান্ন দিনের বন্দীদশার ইতিহাস লিখতে বসেও আমার কার্সর থেকে সেই গ্রাম টির প্রতি ভালোবাসা বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝড়ে পড়ছে আজও। এখন আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি, শুধু সময়ের অপেক্ষা, আমি আবার ফিরে যাবো তার বুকে। সে আমায় ফেরাবে না, অগাধ আস্থা তার প্রতি আমার। তার তীব্র অমোঘ আকর্ষণ কে নস্যাৎ করার মত স্পর্ধা, ক্ষমতা কিছুই আমার নেই। এ ভালোবাসায় যে এক বার নিমজ্জিত হয়, সে কোনোদিন হারে না, হারায় না। তার ঝুলিতে থাকে শুধুই প্রাপ্তির প্রশান্তি। মার্চ, এপ্রিল আর মে'র প্রথম সপ্তাহ-এই এতটা অনিশ্চয়তার চরম দোলাচলের সময় পার করে আসতে পেরেছি যাকে অকৃত্রিম ভালোবেসে, সে আর কেউ নয়, তুষারশুভ্র গিরিরাজ হিমালয়।

না, হিমালয় দর্শন আমার জীবনে এ প্রথম বার নয়, কিন্তু এভাবে প্রথমবার, এতদিন ধরে প্রথমবার। চকৌড়ি তে বাস পঞ্চচুল্লির, যার পৌরাণিক আখ্যান জেনে ছিলাম আগেই। ছবিতে দেখেছিলাম সে সুন্দর, কিন্তু চাক্ষুষ উপলব্ধির অনন্যতা টুকু স্বর্গীয়!! পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তরের আকাশ জুড়ে তার সদাস্তিক উপস্থিতি চকৌড়ি গ্রাম কে রূপ সৌন্দর্য্যের গরিমায় অসামান্য করে তুলেছে। সুন্দরের প্রতি মানুষের মোহ জন্মজন্মান্তর। আর যদি তা হিমালয় হয়, তবে সেই আকর্ষণ তো দুর্নিবার।

বাস্তবিক ভাবে বলতে গেলে হিমালয় কে বহুবার দেখেছি জীবনে, দূর থেকে, কখনও একদম কাছ থেকে। কিন্তু এত বৈচিত্রময় দেখি নি। এত তীব্র, এত সুস্পষ্ট, অমোঘ শুভ্র রূপ তার, আগে কখনো দেখার সৌভাগ্য হয় নি। সারাদিন ধরে তার চূড়োয় খেলে নানা রঙের রামধনু। দিনের এক এক লহমায় তার রূপ এক এক রকম।।কুয়াশার চাদর ভেদ করে সূর্যের প্রথম কিরণ স্নেহের চুম্বন দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে যায়। লাজে রাঙা হয়ে ওঠে একে একে পঞ্চচুল্লির সব ক'টি শৃঙ্গ। ক্রমে সেই অপার্থিব দুধে-আলতা রঙের পরশ পাল্টে যায় নরম এক কমলায়, ধীরে ধীরে যা তার শঙ্খশুভ্র রূপের বহিঃপ্রকাশ করে স্বমহিমায় তাকে স্থাপিত করে দ্রষ্টার মুগ্দ্ধ চোখের অপলক দৃষ্টির উপযুক্ত করে।

সৌন্দর্য্য দুই রকমের হয়। এক হলো আগুন ধরানো সৌন্দর্য্য, যে রূপের হল্কায় পতঙ্গের মত প্রেমিক দগ্ধ হয় প্রতি নিয়ত। আর এক সৌন্দর্য্য হলো কাকচক্ষু সরোবরের ন্যায় শান্ত ও স্থির। তার সামনে কেবল নির্বাক হয়ে বসে থাকতে হয়। একটি শব্দের প্রকাশেও যেন প্রেমের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে! এ প্রেমের উত্তরণ যেমন ধীর, প্রসারের ব্যপ্তিও তেমন দীর্ঘ। চকৌড়ির হিমালয়ের সৌন্দর্য্য সেই মন্দ্রিত তপস্যারত ঋষির ন্যায়, যা বারংবার প্রেমিক কে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করবে তার কাছে ডেকে নিয়ে যেতে। এ রূপের তপস্যা করে, তার সুধা পান করে দুটি মাসে আমার জীবনবোধের সংজ্ঞা টুকুই পাল্টে গেলো। তার গর্বিত বুকের আগলে যে মন আমি হারিয়ে এসেছি, আজ আমার অব্যক্ত যন্ত্রণা কে তা এক সুখস্মৃতিতে পরিণত করেছে মনের অজান্তেই।

তাই যখন বন্ধুরা অনুরোধ করেছিল চকৌড়ির স্মৃতি লেখা নিয়ে, ভেবেছিলাম তা হয়তো আমাদের সেখানের দুটি মাসের নানাবিধ অসুবিধা, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার কথা নিয়েই লিখব। কিন্তু আগেও লিখেছি, এখনও বলছি, চকৌড়ি কে নিয়ে কিছু লিখতে চাইলে আমার মন, আমার মস্তিষ্কের উপর তার একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করছে, যেটা আমার নিয়ন্ত্রণে একেবারেই নেই।

কিছুটা বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা সামাজিক জীব, গতানুগতিক জীবনের বিপরীত কিছু ঘটলেই আমরা নড়ে চড়ে বসি। যা আমাদের হিসাবের বাইরে, অনুমানের ঊর্ধে, তাই আমাদের কাছে মন্দ। শুধু প্রকৃতি কে ভালোবাসার জন্য নির্বাসনে যেতে হবে দীর্ঘ সময়, এ অতি বড়ো রোম্যান্টিক বাঙালি কবিও হয়তো মেনে নিতে পারবেন না। আমরা তো নিছক ট্যুরিস্ট। তাই জালে আটকে পড়া মাছের মতোই আমাদের ছটফটানি শুরু হলো বাড়ি ফেরার তাগিদে। প্রকৃতির সান্নিধ্যের চেয়ে তখন সুখী গৃহকোণের নিশ্চয়তার অভাবই আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে দিবারাত্র।

দলবদ্ধ ভাবে যাওয়া। দলের অন্য মানুষ গুলি কে বিচলিত হতে দেখলে আপনিও চিন্তিত হতে বাধ্য, বিশেষত দলের বেশিরভাগ মানুষই যখন বয়স্ক এবং শরীরে নানারকম রোগের তোয়াক্কা না করেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন বেড়ানোর নেশায়। তাদের কারুর সন্তান হয়তো আটকে পড়েছে দেশের অন্য কোথাও, কোনো ভাবে বাড়ি ফিরে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকেছে, আবার কারুর বা হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই কর্মজীবনের শেষ দিন টা আসন্ন! তারা তখন সকলেই বিপন্ন। তাছাড়া সকলেই যে আমার মতন করে এক পাগলপারা প্রকৃতি প্রেমে নিমজ্জিত থাকবেন, এমন ভাবাটাই মূর্খামি। স্বাভাবিক ভাবেই তাই ততদিনে তাদের অনেকেই প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন, পাহাড়ে আর নৈব নৈব চ!!

আমি আবার এই ব্যপারে বড়োই বেপরোয়া!! একদিকে যেমন তাদের দাবী আবদার মেনে লড়াই করে চলেছি ফেরার রাস্তা অন্বেষণে, অন্যদিকে সেই পাহাড়ী রাস্তার অলি গলি তে মন কে বারংবার হারিয়ে ফেলছি।

বাস্তবে যত নেতা, মন্ত্রী আছে তাদের বারংবার অনুরোধে জেরবার করে তুলছি, আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান; এদিকে মনের অজান্তে গেঁথে চলেছি এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উপাখ্যান!!

চকৌড়ি তে আমাদের দিনগুলো কেমন ভাবে কাটতো তা যদি না বলি, লেখার এসেন্স টা অনেকটাই কম হয়ে যাবে। সেখানে আমাদের দিনগুলো যেন ছিল অশোকবনে সীতার বন্দীদশার মতোই। স্বর্গীয় এক উপতক্যায় আমরা বাস করেছি, অথচ মন পরে থেকেছে ঘরের চার দেওয়ালের নিশ্চিত আশ্রয়ে। দিনগুলি ছিল সত্যি অনির্বচনীয়। দলের সাতাশ জন কেউ রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় নয়, কিন্তু আজ তারা অনেকেই আত্মীয়র চেয়ে বেশি আপন, নির্ভরযোগ্য। এই দুই মাস তাদের সঙ্গে আমরা দিন থেকে রাত সর্ব্বক্ষণ একে ওপরের সঙ্গী হয়েছি। ছোটো ছোটো আনন্দের মুহূর্ত এক সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছি, কাপ কেক কেটে জন্মদিন পালন হয়েছে, আবার অপর কে বিচলিত হতে দেখে তার শোকে আমরাও চোখের জল ধরে রাখতে পারি নি। হোটেলের কামরাগুলিই তখন আমাদের ঘর বাড়ি।

কর্মচারীরা সকলেই ছুটিতে তাই ঘর, বাথরুম পরিস্কার করার কাজ নিজেদের ই করতে হয়েছে প্রতিদিন। সঙ্গে জামাকাপড় ছিল সীমিত, তাই প্রতিদিন নিয়ম করে কাচাকাচি করাটাও প্রাত্যহিক কর্মের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই দুই মাসে চকৌড়ি তে যা গৃহকর্ম করতে হয়েছে, তার কানাকড়িও ঈশ্বরের কৃপায় বাড়ি তে কোনোদিন করতে হয়নি আগে। তার জন্য অবশ্য কোনো আফসোস নেই, কারণ স্বয়ংসম্পূর্ণতাই মানুষ কে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। দেরীতে সই, এই প্রতিকূল পরিস্থিতিই যত্ন নিয়ে আমাকে সেই শিক্ষা দিয়ে গেলো।

সকাল সকাল কাজকর্ম সেরে সকলেই ঝাড়া হাত পা, তারপর শুধু অখন্ড অবসর। পঞ্চচুল্লি কে সামনে রেখে রিসর্টের দাওয়ায় বসে নিরন্তর আড্ডা, মা মাসিমাদের উল বোনা, পরিস্থিতির পর্যালোচনা আর নিরন্তর চিঠি লেখালিখি। টিভির পর্দায় একদিন মুখ দেখতে পাওয়া যাবে, সেই স্বপ্ন অচিরেই পূর্ণ হলো যখন খবরের চ্যানেল গুলি এক এক করে আমাদের দুর্দশার অবস্থা তুলে ধরতে শুরু করলো। এভাবেও বিখ্যাত হওয়া যায়, ভাবি নি কখনও!

খাদ্যদ্রব্যের অভাব, প্রচন্ড ঠান্ডা আবহাওয়া, স্রোতের ন্যায় অর্থের অপচয়, এবং সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক দুরবস্থার চিন্তা দিনে দিনে আমাদের বিপন্ন থেকে বিপর্যস্ত করে তুলছিলো। প্রাথমিক ভাবে কোনো আশার আলো দেখতেই পাই নি কোনও কোণ থেকে।

এর পর শুরু হলো স্থানীয় প্রশাসনের কাছে রেশন ভীক্ষা। বারংবারের অনুরোধে তারা আমাদের একেবারে দূরে সরিয়ে দেননি। একদম গোড়ার দিনগুলি তে না হলেও এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে ধীরে ধীরে আসতে থাকে সাহায্যের অনুদান। সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু বন্ধু বান্ধবী ততদিনে আমাদের ঘরে ফেরানোর জন্য এক প্রকার আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। আমাদের মতো তারাও দ্বারে দ্বারে কড়া নেড়েছে, যদি কোথাও থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিন্তু অতিমারীর ভয়াল গ্রাসে দেশ তখন এখনকার মতই উত্তাল। চকৌড়ির মত গ্রাম তো কোন ছাড়, দেশের অত্যাধুনিক শহরগুলোতেও তখন একে একে তালাবন্দীর সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে অতিক্ষুদ্র এক জীবাণুর আক্রমণে।

যতবার এই ভাইরাস নিয়ে ভাবি, একটাই কথা বারংবার মাথায় ঘুরে ফিরে আসে। যা আমরা চোখে দেখি না, যার উপস্থিতি টের পাই না সহজে, যে আছে বলে মন মানতেই চায় না, সেও কিন্তু এক ঝটকায় আমাদের জীবনে এক উতাল পাতাল স্রোত সৃষ্টি করে মুহূর্তে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দিতে পারে। সেটা ভাইরাস হোক, কী ভালোবাসা!!

এভাবেই থমকে চলছিল জীবন, যখন এক শুভানুধ্যায়ী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসে কিছু অর্থ আমাদের অনুদান দিয়ে যান গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান মহাশয়ের হাত দিয়ে। এই ভদ্র অমায়িক ব্যক্তিটিই একদিন তার পুকুরের টাটকা মাছ এনে খাইয়েছিলেন, উনি হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে মাছ ছাড়া শুধু বেড়ালই নয়, বাঙালিও অসহায়!

চকৌড়ির মানুষগুলি ছিলেন দেবতাসম। তাদের এক জনের কথা আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। শর্মাজী; কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এই মানুষটি পিঠে ব্যাগ আর হাতে হকি স্টিক নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন রোজ। এক এক দিন তাকে এক এক জনের বাড়ির উঠোনে আড্ডা দিতে দেখতাম। আমাদের সঙ্গে বসে মাঝে একেকদিন কিষেণ সিংয়ের দোকানে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ে চুমুক দিতেন, আর স্মৃতির সরণি বেয়ে চলে যেতেন তার কর্মজীবনের দিনগুলি তে। তার প্রশস্ত জীবন দর্শন বড়োই বিস্মিত করতো আমায়। এক বার কী হলো, কাছাকাছি জঙ্গলের ভিতর ছিল একটি লক্ষী নারায়ণের মন্দির। শুকনো পাতার স্তূপে সে মন্দির নিত্য পরিচর্যার অভাবে বড়ই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন। একদিন কথায় কথায় সে কথা ওনাকে বলা তে, বৃদ্ধ মানুষটি নিজেই গিয়ে পিঠ থেকে ব্যাগ নামিয়ে, হকি স্টিক টা এক পাশে রেখে সমস্ত পাতার জঙ্গল সাফ করে দেন। কী দায় ছিল ওনার, বলতে পারেন!

দেখলাম শুকনো ডালপালা পাতা এক জায়গায় জড়ো করে, মন্দির থেকে খুঁজে পেতে দেশলাই নিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দিলেন সেই জঞ্জালের স্তূপে। মন্দিরের দালানে সে দৃশ্য দেখে তো আমরা হৈ হৈ করে উঠি। কিন্তু ওনার ব্যখ্যা শুনে আমরা হতবাক! বললেন, 'দেখ একটা মন্দির কেমন শুকনো বে'জান পরে আছে। না ধূপ জ্বলছে, না আরতি হচ্ছে; তো, এই দেখো কেমন এবার এই শুকনো পাতার ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়ায় চারপাশ ভরে যাচ্ছে, আর ঈশ্বরের সম্মুখে কেমন আরতিও হচ্ছে!''

চকৌড়ির দিনগুলি তাই যেমন আমাদের যন্ত্রণা দিয়েছে, তেমন ভাবে অনেক কিছুই নতুন করে হাত ধরে শিখিয়েছে। এ সত্য অস্বীকার করার কোনও পথ নেই আমার। সেখানকার দিনগুলির মতো

আমাদের ফেরার সংগ্রাম টাও একই ভাবে রোমহর্ষক। ২১ তারিখ সদ্ভাবনার উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি নি যে সামনের দেড় দুই মাস আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে। তাই দুই তিন ফেরার অক্লান্ত চেষ্টা করার পর ভেবেছিলাম যে কষ্ট করে ক'টা দিন কাটিয়েই দিই ৩১শে মার্চ অব্দি; কিন্তু সে গুড়ে বালি! এপ্রিল ফুলের দিন থেকে আমরা আবার বোকা বনে গেলাম পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য, এবং তারওপর আরও অনেকদিনের জন্য।

সে সময় টায় শুরু হলো আমাদের বাড়ি ফেরার চূড়ান্ত সংগ্রাম। সঙ্গে করে আনা টাকাকড়ি প্রায় শেষের পথে, দিনের পর দিন সীমিত খাদ্য খেয়ে, রাতের ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে তখন আমাদের মনোবল একদম তলানি তে। কাছাকাছি না ছিল এটিএম পরিষেবা, না কোনও ব্যাংক বা ওষুধের দোকান। দলের বেশির ভাগ মানুষ বয়স্ক, তাদের কারুর আবার হার্টের অসুখ, সঙ্গে আছে একটি ছোটো বাচ্চা, কেউ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়তো তাহলে যে কী করতাম, কোথায় যেতাম তা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়! কারণ সবচেয়ে কাছের হাসপাতাল টাই ছিল পাহাড়ী পথে প্রায় আশি কিমি দূরে।

এতো সবকিছুর পরেও আসন্ন এক ভয়াবহ বিপদ আমাদের সমূলে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো। আতঙ্কে আমরা দিশাহারা হয়ে গেলাম, যেদিন রাতে রিসর্টের বাগানে উপরের জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ নেমে এসে একটি পোষা কুকুর কে ধরে নিয়ে যায়। চকৌড়ি তে থাকার দিনগুলি তে প্রথম থেকেই শুনতাম সেখানে চিতা বাঘ, হায়না, বুনো শুকর দের রাত্রিবেলায় নিত্য আনাগোনা। কিন্তু সেই প্রথম আমাদের তাদের একজনের সঙ্গে প্রথম এনকাউন্টার। এর পর একটি দিনও সেখানে রাত্রিবাস করা আমাদের কাছে ছিল দুঃসপ্নের মতো, কিন্তু তখনও লড়াই ছিল অনেক খানি বাকি।

সেই সময় সরকারের অকস্মাৎ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মনে প্রচন্ড রাগ হতো, মনে হতো যে এমন হঠকারীর মতো রাতারাতি লক ডাউনের সিদ্ধান্ত না নিয়ে যদি বাহাত্তর ঘন্টা সময়ও সরকার মানুষ কে দিতো, তাহলে হয়তো এই হাজার হাজার মানুষ কে পায়ের রক্তক্ষরণ করে বাড়ি ফেরার এক ভয়াবহ ইতিহাস রচনা করতে হতো না! কিন্তু

যাই হোক, সে প্রসঙ্গ পৃথক, সমস্যাও অনেক বৃহৎ। আজ সে নিয়ে লেখার ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনোটাই আমার নেই।

ফিরে আসি মূল কথায়। আগেও লিখেছি যে কিভাবে ফেরা যায়, বা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুনয় করে আমরা অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দোরগোড়া তেই ধর্ণা দিয়েছি। তাদের কেউ কেউ যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি দিন দিন যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেছে, আমাদের বাড়ি ফেরার সম্ভাবনাও তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থেকেছে।

প্রশাসন থেকে পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা থেকে দাপুটে আমলা কেউই আমাদের কোনও সুখবর শোনাতে পারেন নি সেই সময়ে। সামনের পুলিশ পোস্টে ছিল আমাদের নিত্য আনাগোনা। ওনাদের এতই বিরক্ত করেছি যে শেষেরদিকে আমাকে দেখতে পেলেই ওনারা কোথায় লুকিয়ে পড়বেন স্থির করতে পারতেন না। তবে সে জন্য আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ নেই ওনাদের প্রতি, কারণ আমাদের মিথ্যা আশা দিতে দিতে হয়তো ওনারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ততদিনে।

তবে ক্রমাগত হা হুতাশের দীর্ঘশ্বাস হয়তো স্বয়ং বিধাতার কান অব্দিও পৌঁছে ছিল কোনোভাবে, তাই তো ফেরেস্তার মতো কয়েকজন মানুষ আমাদের উদ্ধারের কান্ডারী হয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই পিথোরাগড়ের সহ জেলাশাসকের কথা না বললেই নয়। উনি হয়তো ওনার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়েই আমাকে অনেক সময়ে ফোন করে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, যে ভাবে আবদার করেছি সেভাবে সাহায্য করেছেন। সুদূর নিজের অফিস থেকে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। এই এত মানুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে লক ডাউনের সময়ে ফেঁসে আছেন, ওনার মত একজন সজ্জন ব্যক্তি যদি প্রত্যেকের পাশে থাকে তাহলে কেউ অন্তত অসহায় বোধ করতো না। হয়তো ওনার উপদেশ সেই ভাবে ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু ফেরত আসার পারমিশন পাওয়ার পর আমাদের ফেরার বন্দোবস্ত করে দিতে উনি বিন্দুমাত্র দেরী করেন নি। কেবল আক্ষেপ একটাই, ওনার সাড়া পেয়েছি আমরা অনেক পর, প্রথমেই যদি পেতাম হয়তো এতো দীর্ঘ দিনের লড়াই লড়ে আমরা ক্লান্ত হতাম না।

আমার দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস যে যোগাযোগ হলো পূর্বনির্ধারিত এক অদৃষ্ট, যখন হওয়ার তখনই হয়। আমাদের ফেরত আসার মওকা এলো তেমন ভাবেই। ঈশ্বর এমন একজন মহানুভব ব্যক্তি র সান্নিধ্যে পৌঁছে দিলেন আমাদের যিনি খোদ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের এক পদস্থ আইপিএস কর্তা।

দরজায় দরজায় ঘুরে যখন আমরা ক্লান্ত, ঠিক তখনই ভয়ে ভয়ে একদিন ফোন ঘোরাই ওনাকে। মনের মধ্যে আশঙ্কা ছিল কী জানি এত পদস্থ ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি না জানি কিই বা মনে করবেন, কেমন ব্যবহার করবেন! আদৌ আমাদের সমস্যা টা ওনার সমস্যা বলে মনে হবে তো? আরও দুই একজন নেতা মন্ত্রীর মত 'আমার কিছু করার নেই' বলে নিরাশ করবেন নাতো! মনের এতো দোলাচল মুহূর্তেই ভ্যানিশ হয়ে যায় ওনার সঙ্গে প্রথম বার ফোনে কথা বলার পরই। এতো বিনীত, ভদ্র, শান্ত অথচ ক্ষমতাশালী পুলিশ অফিসার আমি আমার ইহজন্মে কোনোদিন দেখি নি।

প্রাথমিক ভাবে উনি কোনো কথা দেননি আমাদের। সব সমস্যা টুকু মন দিয়ে শোনেন এবং 'দেখছি কী করা যায়' বলে ফোন রেখে দেন। কথার খেলাফ করেন নি মানুষটি। আমাদের বাড়ি ফেরা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সঙ্গে উনি ছায়ার মতো ছিলেন। যখন যেখানে বিপদে পড়েছি, ওনাকে জানাতে কুন্ঠা বোধ করি নি, উনিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি প্রত্যেক দুর্বিপাকে পড়া মানুষই যেন ওনার মতন কোনো ফেরেস্তার সন্ধান পেয়ে যাক!!

বাড়ি ফেরার মাধ্যম টি অবশ্য মোটেই সুখকর ছিল না। সুদূর সেই উত্তরাখন্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল হয়ে হাওড়া ছিল প্রায় ৫০ ঘন্টার পথ। আমাদের বাহন বলতে একটি স্ট্যান্ডার্ড বাস যেটি প্রায় ১৭০০কিমি রাস্তা আমাদের পক্ষিরাজের মতোই উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এতো টা রাস্তায় লক ডাউনের কারণে দোকান পাট কিছুই খোলা পাই নি। ক্ষিদে, তেষ্টা এমনকি নিত্য প্রাকৃতিক কর্মের প্রয়োজন কেও সংযম করে আমরা বাড়ি ফিরেছি শুধু ফেরার আনন্দেই। পিছনে ফেলে এসেছি আমাদের দুই মাসের এক স্বর্গীয় পৃথিবী, যেখানে তখনও অতিমারী করোনা ভাইরাস আঁচড় বসাতে পারে নি সরল নিষ্পাপ মানুষগুলির জীবনে।

এখনও চোখ বুজলে যন্ত্রণার মুহূর্ত গুলির চেয়ে মুগ্ধ বিহ্বলতার মুহূর্তগুলিই ভেসে ওঠে চোখের সামনে! ভাবনার স্রোত নিমেষেই পাড়ি দেয় কুয়াশার আবছায়া আস্তরণ জড়ানো ঘন সবুজ উপতক্যা থেকে দিগন্ত বিস্তৃত তুষারধবল শৃঙ্গে! দৃশ্য পাল্টে যায়, উন্মচিত হয়ে চোখের সামনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে রঙ বেরঙের ফুলের রায়ট, নরম ঘাসের কার্পেটে মোড়া সবুজ বুগিয়াল আর দিনভর চেনা অচেনা অজস্র পাখিদের কলতান!!

সদ্ভাবনার উঠোন ছেড়ে বাসে ওঠার সময় তাই মনটা ভারী বিষন্ন হয়ে ছিল; লড়াই জেতার আনন্দ তখন মলিন হয়ে এসেছে এক অভূতপূর্ব মায়ার বন্ধন কে কাটিয়ে ফেরার অব্যক্ত যন্ত্রণায়। নেহাত সুখী গৃহকোণের নিশ্চয়তা কে উপেক্ষা করতে পারি না আমরা কেউই, বাস্তবের রুক্ষতা র সঙ্গেই আমাদের নিত্যদিনের সহবাস। যে দুটি মাস আমরা শুধু বাড়ি ফেরার সংগ্রামে যাপন করেছি, কল্পনার অতীত ছিল তাকে ছেড়ে আসার সময় এতো টা শুন্য হয়ে যাবে মন। আজ তাই চকৌড়ির গল্প বলার সময় সকলকেই বলি আমরা সত্যি এক দেবভূমি তেই আশ্রিত ছিলাম ,আর এভাবেও জিতে ফিরে আসা যায়।

EXPANDING BOUNDARIES

Kaushik Mukherjee

It has always been a great opportunity to serve the wider community of Bangiya Parishad Qatar by working in the BPQ Managing Committee.

One of my roles is to manage the membership of this organization.

This year we have got a huge response for new joiners.

Over 50+ new member has joined our organization.

It is always a privilege to know and interact with new people. We receive so many requests to join via the Website, Facebook or by personal contacts. Maintaining the guidelines of the ICC constitution, we do enroll them time to time.

Our esteemed members have renewed their member-ship for 2021 and it contributes to around 93% renewal. We always get the support from our members in the need of the hour for any noble cause.

This helps us to understand and make good relations with so many new people & binds amongst ourselves.

I am very honored to have taken this role as it gives me exposure to know many and increase my boundary of relations.

Blood Donation Camp 2021

Blood Donation Camp 2021

Food Packet Distribution 2021

Food Packet Distribution 2021

অনুপ্রেরণা

সুবীর কুমার দত্ত

বঙ্গীয় পরিষদ কাতারের সাথে আমার সম্পর্ক অনেকটাই যেন নিভৃতে প্রেমালাপ - যেখানে আমার ভূমিকা এক নির্বাক গুণমুগ্ধ প্রশংসকের। এটা আমার সৌভাগ্য বই আর কিছুই নয় যে সুদূর কাতারে এসে আমি বাংলার এক উৎকৃষ্ট সমষ্টির সান্নিধ্য লাভ করেছি - যাদের মনন, চিন্তন, জীবনশৈলী ও মানবিকতা আমার বিচারধারাকে উন্নত করেছে।

বিবিধ গুণাবলীর এমন সাবলীল সমাহার বোধহয় বাঙালি জাতি ছাড়া সম্ভব না । বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানের হৈ-হুল্লোড় হোক, কিংবা দুঃস্থদের ত্রাণার্থে আয়োজিত কোনো সামাজিক প্রয়াস হোক, কাতারের বাঙালিরা সর্বদাই অকৃপণ আর অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বৃহত্তর সমাজ ও মানুষের সাহায্যার্থে বঙ্গীয় পরিষদের ইতিবাচক ভূমিকা এককথায় অনবদ্য ও অনুকরণীয়। একক প্রয়াস হোক বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টা- কার্পণ্য করতে আমাদের বাঙালিরা শেখেনি ।

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বাঙালির সহজাত প্রবৃত্তি- ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীর অধিবাসীদের জন্য একথা বলাই বাহুল্য । কাতারে স্থিত আমাদের বাঙালি পরিবারে সাংস্কৃতিক পরিধি ও মেধা এতটাই সৃজনশীল, উদ্ভাবনী এবং ঐতিহ্যবাহী যে, কোনো ও সার্বজনীন সাংস্কৃতিক বিবিধানুষ্ঠানে বঙ্গীয় পরিষদের উপস্থাপনা অনিবার্য । এমনকি ভারতীয় দূতাবাস বঙ্গীয় পরিষদ কে তাদের প্রথম পছন্দের তালিকায় রেখেছেন - তাৎক্ষণিক পুর্ণমানের অনুষ্ঠান উপস্থাপকদের মধ্যে । বঙ্গীয় পরিষদে এত প্রতিভাশালি সদস্যের সমাহার এখানে প্রতিটি বাঙালির কাছেই এক গর্বের এবং সুখকর অনুভূতি । আমাদের ছোট্ট প্রতিভা-দের এত সৃজনশীল, আনন্দময় ও উৎকৃষ্ট মানের অনুষ্ঠান আমাকে বিস্মিত করে - আশ্বস্ত করে যে আমাদের ঐতিহ্য বেঁচে থাকবে এদের সুযোগ্য প্রতিভায় ও শিক্ষায়।

নতুন করে নিজেকে বাঙালি হবার অনুভূতি আর সেই জন্য গৌরবান্বিত বোধ করার আনন্দ দেওয়ার জন্য - ধন্যবাদ- বঙ্গীয় পরিষদ ।।

ক্রীড়াঙ্গনে...

সংস্কৃতির বন্ধনে...

INDIAN CULTURAL CENTRE
Under the aegis of the Embassy of India

শিরোনামে...

BPQ distributes food packages at labour camps

Bangiya Parishad Qatar (BPQ), a community group, recently conducted a food distribution event for Iftar in co-ordination with Indian Community Benevolent Forum (ICBF) at labour camps. Around 190 food packets along with hand sanitisers were distributed. BPQ president Biswajit Banerji and ICBF president Ziad Usman along with other committee members participate in the event.

BPQ to organise blood donation camp on Friday

Bangiya Parishad Qatar (BPQ) has announced that it is organising blood donation camp in association with the Indian Cultural Centre (ICC), under the aegis of the Indian Embassy in Qatar, on Friday February 12.

The camp will be held at Blood Donor Center, Hamad Medical Corporation, between 3pm and 7pm that day.

In a statement yesterday, BPQ said Indian ambassador Dr Deepak Mittal had "already provided his consent to attend the programme".

Indian Cultural Centre celebrates India's 75th Independence Day

TRIBUNE NEWS NETWORK

A month-long effort by the management committee and participants reverberated on each presentation.

BPQ holds 'Unsung Heroes of Bengal' event

Bangiya Parishad Qatar, an Indian socio-cultural organisation, has held a patriotic cultural event titled 'Unsung Heroes of Bengal' as a tribute to all those heroes who have sacrificed their life for the motherland, in line with 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' in order to celebrate the 75th year of Indian Independence. BPQ also felicitated its ex-presidents to celebrate the organisation's 25th year at the Ashoka Hall, Indian Cultural Centre (ICC). Indian ambassador Dr Deepak Mittal graced the occasion, and the event was also attended by Sachin Dinkar, first secretary, Culture & Education, Indian embassy; Xavier Dhanraj, first secretary, Consular & Community; P N Baburajan, ICC president; Ziad Usman, Indian Community Benevolent Forum president; and other dignitaries. Biswajit Banerji, BPQ president, started the event by felicitating the ambassador. All other dignitaries were also felicitated. Dr Mittal lauded the efforts of BPQ in remembering the great sons of Bengal and India who sacrificed their life for the motherland.

India, Bangladesh embassies celebrate 50 years of friendshi

By Joseph Varghese
Staff Reporter

A music programme.

Bangiya Parishad Qatar marks anniversary

Bangiya Parishad Qatar (BPQ), an Indian socio-cultural organisation, celebrated Diwali along with the 25th anniversary of BPQ and Children's Day on November 12. BPQ president Biswajit Banerji opened the festival by cutting the cake along with ex-presidents Zatish Nandy and Kajol Bhattacharyya. The opening ceremony was followed by a cultural bonanza depicting the Festival of Lights as well as Children's Day.

Copyright © 2021 Bangiya Parishad Qatar - All Rights Reserved

https://bangiyaparishad.com/

facebook

YouTube